Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত করিম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহানূর আক্তার শিমু

রোলঃ 23100120164

৩১শে মে, ২০২৬ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত করিম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহানূর আক্তার শিমু

রোলঃ 23100120164

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাহানূর আক্তার শিমু, আইডিঃ 23100120164 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত করিম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি"** শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা শারাফাত করিম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তারিখঃ

৩১শে মে, ২০২৬ইং

শাহানূর আক্তার শিমু

আইডিঃ 23100120164

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

মৃত্যু ও কবর 9

মৃত্যুর হাকীকত ও মানুষের ঘর 9

কবর কী? 11

কবরের জীবন 13

মুমিন বান্দার মৃত্যু ও কবর 14

কাফেরের মৃত্যু ও কবর 15

কবরে মানবদেহের অবস্থা 17

রুহের গন্তব্যস্থল 21

কবরের সওয়াল, জওয়াব 23

যেমন হবে কবরের সেই চাপ 25

কবরের আযাব: এক অনস্বীকার্য সত্য বাস্তবতা 27

কবরের আযাবের কারণ 30

কবরে নেক বান্দাদের অবস্থা ও পাপীদের আযাব 32

কবরের আযাব থেকে দূরে থাকবে যারা 39

সালাফদের চোখে দেখা কবরের বিভিন্ন অবস্থা 40

সালাফদের দেখা কবরের আযাব 43

কবর সম্পর্কে সালাফদের উপদেশ 56

জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ 59

মৃত্যুহীন পরকালীন জীবন 77

পরকালীন প্রস্তুতি 80

কবরের শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় 80

আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণে মগ্ন থাকা 82

কীভাবে অগ্রসর হতে হবে জান্নাতের দিকে? 88

দুনিয়া বিমুখতা ও ঈমানী পরিবেশে অবস্থান.. 90

পরকালের উদ্দেশ্যে সাদকায়ে জারিয়াহ রাখা 93

ইলম অর্জন ও কুরআনের সাথে সম্পর্ক তৈরি 95

জবানকে সংযত রাখা 97

কবরের আযাব থেকে রক্ষাকারী সূরা 102

আমলের ফজিলত সম্পর্কে জানা ও নেক আমলের প্রতিযোগিতা 104

দৈনন্দিন সুন্নাহ পালন ও দরূদ পাঠে আযাব থেকে মুক্তি.. 107

প্রতিটি মুহূর্তকে পরকালের পাথেয় সংগ্রহতে ব্যয়.. 111

জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের জন্য দু'আ 113

সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ততা 116

নেক আমলের সুবাসে জীবন গড়া.. 121

রবকে পাওয়ার প্রতিটি পথ অবলম্বন 123

উপসংহার 124

গ্রন্থপঞ্জিকা.. 127

ভূমিকা

দুনিয়ার ঘরের জন্য আমাদের কত মেহনত, কত দৌড়-ঝাপ। কিন্তু থাকবো কদিন? কবরের জগতে আমাদের থাকতে হবে অনন্তকাল।

দুনিয়ার বন্ধু আছে বান্ধব আছে, সাথী আছে, কামরায় বাতিও আছে সবই আছে। কিন্তু কবরে নেই কোন সাথী-বাতি আর না আছে সেখান থেকে ফেরার পথ! যেখানে দুনিয়ার একটা কামরায় আমরা অবস্থান করতে অনেক সময় ভয় পাই। কিন্তু কবরের ঘর! সেতো সংকীর্ণ, জরাজীর্ণ, কতই না অন্ধকারপূর্ণ ও ভয়ানক। তবে যে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী নিজের জীবনকে সাজাবে তার নেই কোন ভয়, নেই কোন টেনশন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থ: শোন! আল্লাহর অলীদের কোন ভয় নেই, নেই তাদের কোন টেনশন। (সূরা ইউনুস, আয়াত:৬২, পারা: ১১)

অন্যদিকে যারা কাফের, যারা বেঈমান, যারা অপরাধী তাদের নেই দুঃখ- কষ্টের কোন শেষ। নদীতে যদি একটি গরু অথবা বকরী মরা থাকে তা থেকে কুকুর খায়, শিয়ালে খায়, পোকায় খায়। এক পর্যায় হাড্ডি পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায়। তেমনিভাবে কবরের ভিতর আছে সাপ-বিচ্ছু, বড় বড় পোকা। পাপীদের লাশ রাখার সাথে সাথে পাশের কবর থেকে বড় বড় পোকা এসে লাশটির শরীর, চেহারা বিকৃত করে দিবে। বড় বড় সাপ দংশন করতে থাকবে, বিচ্ছু কামড় দিতে থাকবে।

অথচ মানবজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে অনন্তকালের অবস্থান তার জন্য আমাদের নেই কোন প্রস্তুতি। কিন্তু পার্থিব উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা সাজানোর পেছনে ঠিকই আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করি। কীভাবে বাড়ি বানাব, কীভাবে গাড়ি কিনব, বিয়ের জন্য পাত্রী বাছাই পর্বেও চলে কত পরিকল্পনা... কীভাবে পছন্দের মেয়েটিকে পাব জীবনসঙ্গিনীরূপে, কীভাবে ব্যবসায় লাভবান হয়ে আরো ধন-সম্পদ বাড়াব- এভাবে নানান কাজে নানান রকম পরিকল্পনা আমরা করি। নিজে না জানলে শরণাপন্ন হই অন্যের কাছে।

পার্থিব বিষয় নিয়েই সারাক্ষণ চিন্তায় ডুবে থাকে, দুনিয়া নিয়ে মাথা কুটে কুটে মরে আমাদের চারপাশে এমন লোকের সংখ্যা অসংখ্য-অগণিত। কিন্তু পরকাল নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। চিন্তা-ফিকির করার সময়ও নেই। আখিরাতের কামিয়াবি অর্জনের জন্য নেই কোন পরিকল্পনা। কীভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব, কীভাবে জান্নাতের এক স্তর থেকে আরও উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারব- এসব চিন্তা তাদের ভাবনার আওতায় পড়ার যোগ্যতা রাখে না। পার্থিব জীবনকে সাজানোর জন্যই আমাদের এত শত পরিকল্পনা। কিন্তু আমাদের পরকালের পরিকল্পনা? পরকালের প্রস্তুতি?

আবু জাফর আল-কুরাশি বলেন,

أتعمى عن الدنيا وأنت بصير ... وتجهل ما فيها وأنت خبير
وتصبح تبنيها كأنك خالد ... وأنت غدا عما بنيت تسير
فلو كان فيها لي الذي أنت عارف ... لقد كان فيما قد بلوت نذير
متى أبصرت عيناك شيئا فلم .... يكن له مخبر أن البقاء يسير
قدونك فاصنع كلما أنت صانع ... فإن بيوت الميتين قبور.

“তুমি কি দুনিয়া সম্পর্কে অন্ধ, অথচ তুমি চক্ষুষ্মান? তুমি কি দুনিয়ায় যা কিছু আছে সে বিষয়ে অজ্ঞ, অথচ তুমি বুদ্ধিমান? তুমি তাতে প্রাসাদ নির্মাণ করেই যাচ্ছ, যেন তুমি চিরকাল থাকবে। অথচ তুমি যে ভবন তৈরি করেছ, (হয়তো) আগামীকালই তা ছেড়ে চলে যাবে। তুমি যে বিষয়ে অবহিত আছো তা যদি তোমাকে (এসব কাজে) বাঁধা দিত, তবে তুমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ তাতে একজন ভীতি প্রদর্শক পাওয়া যেত। যখন তোমার দু' চোখ সরাসরি কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ করেছে তখন তার জন্য (স্বতন্ত্রভাবে) কোনো সংবাদদাতার প্রয়োজন নেই যে, দুনিয়ায় বেঁচে থাকা সামান্য। তোমার যা মনে চায় তুমি তাই করো। তবে সাবধান! ভোগ বিলাসে মত্তদের বাসগৃহও সেই কবর।”

মৃত্যু ও কবর

মৃত্যুর হাকীকত ও মানুষের ঘর

মৃত্যু-সে এক অমোঘ সত্য, সকল প্রাণী যার মুখোমুখি হবে। এমন এক পেয়ালা, সকল প্রাণী যার শরবত পান করবে। এমন এক ফটক, যার দিকে নিয়তি আমাদের হাঁকিয়ে নিয়ে চলছে। সেই ফটক দিয়েই মানুষ প্রবেশ করে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে।

মৃত্যুর হাকীকত বা প্রকৃত সত্য হলো এটি কেবল পার্থিব জীবনের সমাপ্তি বা ধ্বংস নয়, বরং এটি একটি অবিনশ্বর অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার। মানুষের আত্মা ও দেহের পার্থিব সম্পর্কের স্থায়ী বিচ্ছেদ এবং অনন্তকালের আখেরাতের জীবনের যাত্রা শুরু।
পৃথিবীতে মানুষের বর্তমান ঠিকানা ক্ষণস্থায়ী, আর মানুষের মূল ও স্থায়ী ঘর হলো আখেরাত।

মৃত্যুই মানব জীবনের শেষ নয়, জন্মের মাধ্যমে যেমন মাতৃগর্ভের সংক্ষিপ্ত জীবন শেষ হয়ে দুনিয়ার জীবন শুরু হয়। তেমনি মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের শেষে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন শুরু হয়, সে জীবনের শুরু আছে শেষ নাই।

মৃত্যু অবধারিত, মৃত্যু থেকে কারো রেহাই পাওয়ার কোন রকম সুযোগ নেই।

জিন্দেগীর এই হায়াত ৬০ থেকে ৭০ অথবা সর্বোচ্চ ১২০ বছর। যারা নাস্তিক আল্লাহকে অস্বীকার করে, পরকালকে অস্বীকার করে, মিযান, পুলসিরাত, হিসাব-নিকাশ, রাসূল, কিতাব, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম মোটকথা ইসলামের সকল আকীদা চিন্তা-চেতনা সবকিছু অস্বীকার করে তারাও কিন্তু মৃত্যুকে অবশ্যই স্বীকার করে। তাহলে পৃথিবীতে একটি বিষয় এমন আছে যাতে কোন মত বিরোধ নেই তা হলো "মৃত্যু"। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থ: প্রতিটি প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে।
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৮৫- পারা: 8)

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ

অর্থ: এবং নিশ্চয়ই মৃত্যুর যন্ত্রণা আসবেই।
(সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৯)

আর সব মানুষের ঘর তিনটি। তা হলো:
১. দুনিয়ার ঘর,
২. কবরের ঘর আর
৩. আখেরাতের ঘর।
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ দুনিয়ার ঘরে থাকে দুনিয়ার জীবন খুব অল্প, খুবই অল্প। কিন্তু দুনিয়ার ঘর তৈরির জন্য মানুষের কত চেষ্টা-মেহনত, কত দৌড়ঝাপ। অথচ মৃত্যুর কথা কবরের কথা ভুলে যায়। আখেরাতের অনন্ত জীবনের কথা একেবারে ভুলে যায়। কিন্তু মৃত্যু মানুষকে ভুলে না। যখন সময় হয় এক মুহূর্ত আগেও আসে না এক মুহূর্ত পরেও আসে না। ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়। আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.

অর্থ: যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে আর না এগিয়ে আসতে পারবে।
(সুরা আরাফ, আয়াত: ৩৪)

প্রাণ চলে যাওয়াই কেবল মৃত্যু নয়; বরং মৃত্যু ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত ব্যক্তিদের স্বাদ-উপভোগ বিনষ্টকারী, আরাম-আয়েশে মজে যাওয়া লোকদের আরাম-আয়েশ ধ্বংসকারী এবং বুদ্ধিমানদের জন্য এই দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়া থেকে সতর্ককারী।

কবির ভাষায়:
“মরন থেকে পালাও যতই
মরন তোমায় লইবে ঘিরি,
যদিও সুদৃঢ় আকাশ পানে পালাও,
সেথায় লাগিয়ে সিড়ি।”

কবর কী?

ইসলামে কবর কেবল একটি বিশ্রামস্থল নয়, এটি পরকালের দিকে আমাদের যাত্রার সূচনা। কবর অর্থ কোনো কিছু গোপন করা বা দাফন করা। কবর আখিরাতের সর্বপ্রথম মঞ্জিল। কবর হলো অন্ধকার, সংকীর্ণতা ও একাকিত্বের ঘর। মৃত্যুর পর মানুষকে বালিশ ও বিছানা ছাড়াই এই ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়। পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, স্বাদ-আহ্লাদ-সবকিছু ছেড়ে শুয়ে থাকতে হয় মাটির বিছানায়। সুতরাং কোন বান্দা যদি কবর থেকে মুক্তি লাভ করে তাহলে তার পরবর্তী ধাপ তার চেয়েও অতি সহজ। আর যদি কবর থেকে মুক্তি লাভ না করে, তাহলে তার পরবর্তী ধাপ তার তুলনায় অত্যধিক কঠিন।

এই কবর হল সেই কঠিন ঘাঁটি, যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

"আমি কবরের চেয়ে কঠিন এবং ভীতিকর জায়গা দ্বিতীয়টি দেখিনি।"
(মুসনাদে আহমাদ: ১/৬৪ হাদীস নং ৪৫৪)

অন্য হাদীসে হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত রয়েছে-

وَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا نَخْلاً لِبَنِي النَّجَّارِ ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رِجَالٍ مِنْ بَنِي النقل مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا مِنَ اللهِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বনু নাজ্জার গোত্রের এব খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের কতিপয় মৃত লোকের আওয়াজ শুনতে পেলেন যারা জাহেলী যুগে মারা গিয়েছিল। কবরে তাদের আযাব হচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কবরের আযাবের ভয়ে বের হয়ে এলেন এবং সাহাবীদের আদেশ করলেন যেন তারা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চান।
(মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ৩/৫৮৪ হাদীস নং ৬৭৪২)

জনৈক দার্শনিক বলেন, "চারটি বস্তু চারটি বস্তুর সাগর। মৃত্যু জীবনের সাগর, প্রবৃত্তি আসক্তির সাগর। কবর লজ্জার সাগর। আল্লাহর ক্ষমা গুনাহসমূহের সাগর।"

সুতরাং কবর হলো এমন এক নিঃসঙ্গ ও নীরব স্থান, যেখানে দুনিয়ার কোনো প্রতিপত্তি, অর্থ বা আত্মীয়-স্বজন কোনো কাজে আসবে না। খাঁটি ঈমান, নিয়মিত ইবাদত এবং সৎকর্মই হবে সেখানে একমাত্র সঙ্গী ও মুক্তির উপায়।

কবরের জীবন

কবরের জীবনকে আলমে বারযাখও বলা হয়। কবরের জীবন বা 'বারযাখ' হলো পার্থিব জীবন ও আখিরাতের মধ্যবর্তী একটি ক্ষণস্থায়ী জগৎ। এখানে মুমিনদের জন্য থাকে শান্তির সুসংবাদ এবং পাপীদের জন্য শাস্তির হাতছানি রয়েছে। এই অনিবার্য সত্যের মুখোমুখি হওয়ার জন্য সঠিক ঈমান ও সৎ আমলের বিকল্প নেই। মানুষ মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন হয়ে দুনিয়ার রঙিন স্বপ্নে মেতে থাকে। মত্ত থাকে খেলাধুলা ও অহেতকু কর্মকাণ্ডে। জীবন চলে বেপরোয়া। এমনই সময় হানা দেয় মৃত্যু। অতঃপর স্বপ্ন ও সাধের প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হয় মাটির গর্তে। এটাই সবার নিয়তি। সুতরাং সাবধান! সেই ঘরে যাওয়ার পূর্বে তার জন্য সামানা সংগ্রহ করে নাও।

ইউসুফ আবুল হাজ্জাজ আলহানি বলেন, "আমি এবং আবু উমামা একবার একটি জানাজার নামাজ আদায় করলাম। অতঃপর যখন মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে রাখা হলো, তখন আবু উমামা বললেন, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত এটা একটি আবাসস্থল।"

দুনিয়াতে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হলেই অস্বস্তি লাগে; যদিও সে ঘর উত্তম হয়। কবরে যাওয়ার পর বুঝা যায়, দুই ঘরের মাঝে কত পার্থক্য!

আবু সাইদ খুদরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ (সা:) জানাজার নামাজে এসে দেখলেন, কিছু লোক হাসাহাসি করছেন। তিনি বললেন, ওহে, তোমরা যদি জীবনের স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি মনে করতে, তাহলে আমি তোমাদের যে অবস্থায় দেখতে পেলাম, তা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে। তোমরা জীবনের স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে খুব বেশি স্মরণ করো। কেননা, কবর প্রতিদিন দুনিয়াবাসীকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, আমি অপরিচিত ঘর, আমি একাকিত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর।"

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.

অর্থ: ঐ পরকালীন ঘর আমি তাদের দেব, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর খোদাভীরুদের জন্যেই শুভপরিণাম।
(সূরা কাসাস, আয়াত-৮৩)

মুমিন বান্দার মৃত্যু ও কবর

মুমিন বান্দার মৃত্যু ও কবর হলো পরকালীন অনন্ত জীবনের প্রথম ধাপ। মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা মুমিনের রূহ অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে কবজ করেন এবং পরপারে তাকে রাজকীয় সম্মান ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়। মুমিন বান্দার মৃত্যু কোনো কষ্ট বা শাস্তির বিষয় নয়, বরং এটি আল্লাহর সাক্ষাৎ ও নৈকট্য লাভের এক পরম আনন্দময় যাত্রা।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিন ও কাফেরের মৃত্যুর আলাদা আলাদা ধরণের কথা বর্ণনা করেছেন। যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, যখন মুমিনের মৃত্যুর সময় আসে, তখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল চেহারার ফেরেশতা জান্নাত থেকে সুগন্ধিযুক্ত সাদা রেশমি কাপড় নিজেদের সাথে নিয়ে আসেন। এসে মুমিনকে "আসসালামু আলাইকুম" বলেন। মালাকুল মউত রূহ কবজ করার আগে তাকে সুসংবাদ দেন- 'হে পবিত্র রূহ! তুমি খুশি হয়ে যাও, তোমার জন্য আল্লাহর রহমত এবং জান্নাতের সমূহ নেয়ামত রয়েছে।'

যখন কোনো মুমিন বান্দাকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে, 'স্বাগতম' তোমাকে। আমার পিঠের ওপর যত মানুষ চলাফেরা করে, তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আজ যখন তুমি আমার তত্ত্বাবধানে এসেছ এবং তুমি আমারই হয়ে গেছো, তখন তোমার সঙ্গে আমি কেমন সৌজন্যমূলক আচরণ করি, তা অচিরেই তুমি দেখতে পাবে। এরপর দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত কবর তার জন্য বিস্তৃত হয়ে যায় এবং জান্নাতের দিকে তার একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়।

কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, মুমিন ব্যক্তি বলে- 'আমি নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে যেতে চাই, যাতে তাদেরকে নেক আমলের পুরস্কার সম্পর্কে অবহিত করতে পারি।' উত্তরে ফেরেশতারা বলেন- 'আচ্ছা, তুমি এখন আরামে দুলার মতো ঘুমোও।' তখন মুমিন ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়ে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কবর থেকে উঠাবেন।

কাফেরের মৃত্যু ও কবর

মৃত্যুর সময় কাফেরেরা খুবই কঠিন ও ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হয়ে থাকে। কেননা ফেরেশতারা তাদের আত্মা অত্যন্ত কঠোরভাবে শরীর থেকে টেনে বের করে। তারা আল্লাহর গজব ও শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার আভাস পেয়ে আঁতকে ওঠে এবং আত্মা শরীর থেকে বের হতে চায় না। কবর তাদের জন্য একটি সংকীর্ণ ও ভয়াবহ স্থানে পরিণত হয়।

যখন কাফেরের মৃত্যুর সময় হয়, তখন তার রূহ কবজ করার জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কালো চেহারার ফেরেশতা দুর্গন্ধময় চটের কাপড় সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং এসেই তাকে ‘হে খবীস রূহ! হে অভিশপ্ত রূহ!’ বলে সম্বোধন করেন। তাকে আল্লাহর গজব এবং জাহান্নামের শাস্তির 'সংবাদ' দান করেন। কাফেরের রূহ ভয়ে দেহ থেকে বের হতে চায় না। ফেরেশতারা তাকে টেনেহিঁচড়ে এমনভাবে বের করেন, যেমন কাঁটাযুক্ত লোহার শলাকা ভেজা পশমের ভিতর থেকে জবরদস্তি করে বের করা হয়। কুরআন মাজীদে ওই অবস্থার বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে-

وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا.

অর্থ: শপথ সেই ফেরেশতাদের, যারা কাফেরদের রূহ দেহের মধ্যে ডুব দিয়ে বের করে আনে। অর্থাৎ সে বের হতে চায় না; কিন্তু ফেরেশতারা জবরদস্তি করে বের করে আনেন। (সূরা নাযিয়াত, আয়াত:১)

আর যখন কোনো কাফির বা বদকার বান্দাকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে, আমার পিঠের ওপর যারা বিচরণ করে, তাদের মাঝে তুমিই ছিলে আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য। আজ যখন তুমি আমার কবজায় এসেছ এবং আমার কাছেই চলে এসেছ, তখন তোমার সঙ্গে আমার কী ব্যবহার হবে, তা অচিরেই দেখতে পাবে। এই বলে কবর তার ওপর চেপে যায়; ফলে তার পাঁজরের হাড়গুলো একটি আরেকটির মধ্যে ঢুকে যায়।

ফেরেশতারা তাদের লোহার মুগুর বা হাতুড়ি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করতে থাকে, যার ফলে তারা বিকট চিৎকার করতে থাকে। মানুষ ও জিন ছাড়া পৃথিবীর সবাই সেই চিৎকার শুনতে পায়।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

'হাতুড়ি এত ওজনের যে, যদি পাহাড়ের উপর মারা হয়, তা হলে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।' এর পাশাপাশি কাফেরের জন্য ৯৯টি অজগর নিযুক্ত করে দেওয়া হয়, যেগুলো তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে।

কবরের মধ্যে কাফেরের নিকট একজন অত্যন্ত বিকট দর্শন, দুর্গন্ধযুক্ত এবং ভয়ানক আকৃতির মানুষ আসে। কাফের জিজ্ঞাসা করে- 'তুমি কে?' সে বলে- 'আমি তোমার আমল, তোমাকে খারাপ আমলের খবর দেওয়ার জন্য এসেছি।' কাফের ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বলে- 'হে আমার রব! কিয়ামত কায়েম করো না।' তা ছাড়া কাফের মৃত্যুর সময় থেকেই আল্লাহর আযাবের মধ্যে পতিত হয় এবং কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত একের পর এক আযাবে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে মুসলমানদের কবরের আযাব থেকে হেফাজত করুন, আমীন।

কবরে মানবদেহের অবস্থা

মৃত্যুর পর কবরে মানুষের শরীর ও আত্মার একটি নির্দিষ্ট অবস্থা থাকে। মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষের দেহ কবরে স্বাভাবিক নিয়মে ধীরে ধীরে পচে মাটিতে মিশে যায়। তবে নবী ও রাসূলগণের দেহ পচে যাওয়া আল্লাহ তা'য়ালা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন, তাই তাদের দেহ সবসময় অক্ষত থাকে।

কবরে মানুষের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পচে-গলে শেষ হয়ে যায়; কেবলমাত্র মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের একটুকরা হাঁড় বাকি থাকে। কিয়ামতের দিন এ হাঁড়ের টুকরা থেকে তাকে আবার সৃষ্টি করা হবে।

নবীগণ ব্যতীত অন্য লোকদের শরীর মেরু দন্ডের হাড্ডি ব্যতীত সমস্ত শরীর মাটি হয়ে যায়। এ সংক্রান্ত হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ وَمِنْهُ يُركب الخلق يوم القيامة. رواه ابن ماجة

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

মানুষের শরীরের একটি হাড্ডি ব্যতীত শরীরের সমস্ত হাড্ডি মাটি হয়ে যায়। আর তা হলো মেরু দন্ডের হাড্ডি। কিয়ামতের দিন তা থেকেই মানুষ কে পুনরুত্থান করা হবে।
(ইবনে মাযাহ)

আবু সাঈদ (রা:) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোমরের মেরুদণ্ডের অস্থি ছাড়া মানব দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটি খেয়ে ফেলে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! ওটা কি? উত্তরে তিনি বললেন, ওটা একটা সরিষার বীজের সমপরিমাণ জিনিস, ওটা থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে।"
(ফাতহুল বারী- ৮/৪১৪, মুসলিম-৪/২২৭০)

অর্থাৎ হাদিসের আলোকে মানুষের শরীরের এই অংশটিই প্রথম সৃষ্টি করা হয়। তারপর আল্লাহ তা'য়ালা সেটিকে টিকিয়ে রাখবেন, কিয়ামতের দিন আবারও সেখান থেকে মানুষের অবকাঠামো সৃষ্টি করার জন্য।

তবে নবি ও শহিদদের শরীর মাটি খাবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন-

بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

অর্থ: বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।
(সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৯)

এজন্য তাদের গোসল দিতে হয় না এবং তাদের জানাযাও পড়তে হয় না। বিষয়টি প্রমাণিত হয় সহিহ হাদিসসমূহের আলোকে প্রতিষ্ঠিত উহুদ ইত্যাদি বিভিন্ন যুদ্ধের ইতিহাস থেকে। কিন্তু হানাফি মাযহাব ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে, শহিদদের জানাযার নামাজ পড়া হবে।

আওস ইবনু আওস আস-সাকাফি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ .

"দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো জুমার দিন। এ-দিনই আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ-দিনই তার মৃত্যু হয়েছে, এ-দিনই শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং কিয়ামতের বিকট শব্দটিও হবে এ-দিনেই। অতএব, এ-দিন তোমরা বেশি বেশি আমার ওপর দরুদ পড়ো! কেননা, তোমাদের দরুদ আমার কাছে উপস্থাপন করা হয়।"

(সুনানে আবু দাউদ, ২৩৯)

বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন,
'হে আল্লাহর রাসুল! কীভাবে আমাদের দরুদ আপনার সামনে উপস্থাপন করা হবে, অথচ আপনি পচে যাবেন?' জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

"আল্লাহ জমিনের ওপর নবিদের শরীর ভক্ষণ করাকে হারাম করে দিয়েছেন।"
(ইবনুল আরাবি)

কবরে শহিদদের অবস্থা নিয়েও বর্ণিত আছে যে, উহুদের যুদ্ধে শহিদ গণের লাশ ৪৬ বছর পরও তরুতাজা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي صَعصعة رحمة الله انه بلغة أن عمرو بن الجموح ، و عبد الله بن عَمْرٍو الْأَنْصَارِّيَيْنَ ثُمَّ السَّلَمِيِّين كانا قد حفر السيل من قبريهما وكان قَبْرَاهُمَا مِمَّا يلى السيل وَكَانَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَهُمَا مِمَّنِ استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرًا كَأَنَّهُمَا مَاتَا بِالْأَمْسِ وَكَانَ أَحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فَأُمِيطَتْ يَدَهُ عَنْ جُرْحِهِ ثُمَّ ارْسِلَتْ فرجعت كما كانت وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما است وَ أَرْبَعُونَ سَنَةً . رَوَاهُ مَالِكٌ

আবদুর রহমান বিন আবু সা'সা (রহি.) থেকে বর্ণিত যে,
"আমর বিন জুমুহ এবং আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) তারা উভয়ে উহুদের যুদ্ধে শহিদ হয়েছে, পানির স্রোতে তাদের কবর ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল, তাদের উভয়কে একই কবরে দাফন করা হয়ে ছিল, তখন তাদের কবর খনন করা হল যাতে তাদের মৃতদেহ অন্যত্র স্থানান্তর করা যায়। তাদের উভয়ের মৃত দেহে কোন প্রকার পরির্বতন পরিলক্ষি হয় নি। বরং দেখে মনে হচ্ছিল যে তারা যেন গতকাল শহিদ হয়েছে। তাদের উভয়ের একজনের শরীরে যখন যখম লাগল তখন তিনি ব্যাথায় সেখানে হাত রাখলেন, তাকে অন্যত্র দাফন করার সময়

লোকেরা তাঁর হাত ওখান থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইল কিন্তু হাত ওখানেই থেকে গেল। এ কবর খননের ঘটনা ঘটেছিল উহুদ যুদ্ধের চল্লিশ বছর পর।

(কিতাবুল জিহাদ, বাবু দাফনি ফী কবরিন ওয়াহেদ মিন জরুরা)

রুহের গন্তব্যস্থল

মৃত্যুর পর রুহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ‘বরযাখ’ নামক একটি অন্তর্বর্তীকালীন জগতে চলে যায়।

যখন মুমিনের রুহ কবজ করা হয় তখন তা একজন ফেরেশতার নিকট উঠিয়ে নেওয়া হয়, যার নাম “রুমিয়েল”। তিনি মুমিনদের রুহ সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত।

জান্নাতের নিয়ামতের সুসংবাদ শুনার পর আল্লাহর কাছে যাওয়ার তীব্র বাসনা সৃষ্টি হয় এবং মুমিন ব্যক্তির রূহ তার দেহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যায়, যেমন মশকের মুখ খুলে দিলে পানি প্রবাহিত হয়ে পড়ে। ফেরেশতারা রূহ কবজ করার পর সুগন্ধিযুক্ত সাদা কাপড়ে জড়িয়ে ফেলেন এবং আসমানের দিকে নিয়ে যান। এ সময় মুমিন ব্যক্তির রূহ থেকে এমন সতেজ খুশবু আসে যে, আসমানের ফেরেশতারা তা অনুভব করে পরস্পরে বলাবলি করেন- 'কোনো মুমিন ব্যক্তির রূহ উপরে আসছে।'

ফেরেশতারা আসমানের দরজায় টোকা দিলে প্রথম আসমানের ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করেন- এই পবিত্র রূহ কে? জওয়াবে ফেরেশতারা বলেন- 'অমুকের পুত্র অমুক'। আসমানের ফেরেশতারা তার জন্য দরজা খুলে দেন; তাকে খোশ আমদেদ জ্ঞাপন করেন এবং পবিত্র রূহকে আল্লাহ তা'য়ালার অপরিসীম রহমত এবং নেয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করেন। ফেরেশতারা তাকে পরবর্তী আসমানের দিকে নিয়ে যান। প্রথম আসমানের ফেরেশতারা মুমিন ব্যক্তির সম্মান প্রদর্শনের জন্য “আল-বিদা” বলতে বলতে পরবর্তী আসমান পর্যন্ত আসেন। দ্বিতীয় আসমানে মুমিনের রূহকে প্রথম আসমানের মতো খোশ আমদেদ বলা হয়। এমনইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ আসমান হয়ে অবশেষে রূহ সপ্তম আসমানে পৌঁছে যায়। সেখানে পৌছার পর আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, আমার বান্দার নাম ইল্লিইয়ীন (সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী লোকদের তালিকা)-এ লিখে দাও। তারপর তার রূহকে প্রশ্নোত্তর করার জন্য পুনরায় তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

আর যখন কাফেরের মৃত্যুর সময় হয়, তখন তার রূহ কবজ করার জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কালো চেহারার ফেরেশতা দুর্গন্ধময় চটের কাপড় সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং এসেই তাকে ‘হে খবীস রূহ! হে অভিশপ্ত রূহ!’ বলে সম্বোধন করেন। তাকে আল্লাহর গজব এবং জাহান্নামের

শাস্তির 'সংবাদ' দান করেন। কাফেরের রূহ ভয়ে দেহ থেকে বের হতে চায় না। ফেরেশতারা তাকে টেনেহিঁচড়ে এমনভাবে বের করেন, যেমন কাঁটাযুক্ত লোহার শলাকা ভেজা পশমের ভিতর থেকে জবরদস্তি করে বের করা হয়।

এ সময় কাফেরের রূহ থেকে এমন দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে, যেমন কোনো পঁচা গলা মৃত প্রাণী থেকে গন্ধ বের হয়ে থাকে।

যে ফেরেশতা কাফেরের রুহ সংরক্ষণের দায়িত্বে আছেন, তার নাম "দুমা"। ফেরেশতারা যখন তাকে নিয়ে আসমানের দিকে ওঠেন, তখন আসমানের ফেরেশতারা সেখান থেকেই তার দুর্গন্ধ অনুভব করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন- 'কোনো খবীস রূহ আসমানের দিকে আনা হচ্ছে।'

তারপর যখন মৃত্যুর ফেরেশতা কাফেরের দুর্গন্ধযুক্ত রূহ নিয়ে প্রথম আসমানে ওঠেন, তখন কড়া নাড়বার পর বলা হয়- 'এ কে?' উত্তরে মওতের ফেরেশতা বলেন- 'অমুকের পুত্র অমুক'। আসমানের ফেরেশতারা উত্তর দেন- 'এই খবীস দেহের, খবীস রূহের জন্য কোনো অভিনন্দন নেই। তার জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না। তাকে লাঞ্ছিত করে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও।' তখন ফেরেশতারা তাকে প্রথম আসমান থেকেই দুনিয়াতে নিক্ষেপ করেন। অন্যদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম হয় যে, তার নাম সিজ্জীন (অর্থাৎ কাফেরদের তালিকা)-এ লিখে দাও। অতঃপর তার রূহকে প্রশ্ন-উত্তরের জন্য আবার তার দেহে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন-উত্তরের পর মুমিনের রূহকে "ইল্লিইয়ীন" এর মধ্যে থাকতে দেওয়া হয়। আর কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের রূহকে বন্দী করা হয় "সিজ্জীনে"। মনে রাখতে হবে, "ইল্লিইয়ীন" একটি কিতাবেরও নাম- যার মধ্যে মুমিনদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। আবার একটি জায়গারও নাম- যেখানে ঈমানদারদের রূহসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে। তেমনইভাবে "সিজ্জীন" একটি কিতাবেরও নাম- যার মধ্যে কাফের ও মুশরিকদের নাম লেখা হয়। আবার একটি জায়গারও নাম- যেখানে কাফের মুশরিকদের রূহগুলো কিয়ামত পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হবে।

কবরের সওয়াল, জওয়াব

মৃত্যুর পর কবরের মধ্যে মুনকার-নাকীর তিনটি প্রশ্নই করে থাকেন। বাহ্যত এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে এই যে, এই তিনটি প্রশ্ন এমনই ব্যাপক যে, মানুষের সম্পূর্ণ জীবনের সারাংশ এই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। কবরের মধ্যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সেই দিতে পারবে, যার পুরো জীবন এই তিন প্রশ্নের উত্তর অনুসারে আমল করে অতিবাহিত হয়েছে। ইলমের বড়াই বা জ্ঞানবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের কোনো কাজে আসবে না। অথচ মুনকার- নাকীরের করা তিনটা প্রশ্ন ও তার উত্তর আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নগুলো হলো:

১. مَنْ رَّبُّكَ؟ তোমার রব কে?
২. مَنْ نَبِيُّكَ؟ তোমার নবী কে?
৩. مَا دِيْنُكَ؟ তোমার দ্বীন কী?

উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর-

১. رَبِّيَ اللهُ 'আমার রব আল্লাহ'।
২. نَبِيِّيْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 'আমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)' এবং
৩. دِيْنِيْ اَلْاِسْلَام 'আমার দ্বীন ইসলাম'।

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ও সোজা উত্তর গুলোর সম্পর্ক মানুষের পুরো আমলী জীবনের সাথে।

ওই ব্যক্তির যবান থেকে উত্তর গুলো বের হবে, যিনি সারা জীবন বাস্তবেই আল্লাহকে নিজের ইলাহ এবং মা'বুদ হিসেবে মনে করেছেন। এক আল্লাহকেই নিজের সাহায্যকারী এবং বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, নিজের ভাগ্য, নিজের জীবন ও নিজের মৃত্যুর মালিক মনে করেছেন। শুধু তাঁরই ভয় দিলের মধ্যে পুষেছেন। যে বাক্তি নামায, রোযা, সাদকা থেকে নিয়ে সকল কিছু রাসূল (সা:)-এর আনুগত্য ও অনুকরণ করেছে, বিয়ে-শাদি এবং জীবন-মরণ পর্যন্ত সকল কার্যাবলিতে সুন্নাহকে প্রাধান্য দেয়- তার যবান দিয়েই বের হবে সঠিক উত্তর। যারা দুনিয়াতে সৎ ছিলেন এবং আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলেন, তারা নির্দ্বিধায় সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। ফলে তাদের কবর জান্নাতের বাগিচায় পরিণত হবে। আর যারা সঠিক উত্তর দিতে

পারবে না বা অস্বীকার করবে, তারা উত্তর দিতে গিয়ে বলবে, "হায়! আমি জানি না"। তখন তাদের কবরে ভয়াবহ আযাব শুরু হবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি সারা জীবন ইসলামী নিয়মপদ্ধতি মোতাবেক অতিবাহিত করবে, ইসলামী জীবন গ্রহণ করবে, ইসলামী নীতিমালা এবং বিধিমালার পাবন্দী করবে, ইসলামী নিদর্শনাবলিকে শ্রদ্ধা করবে, তার মুখেই এই সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর বের হবে, সেই হবে সফলকাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইহুদী, নাসারা এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জীবনরীতি, আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করবে, তাদের রং-ঢং ও চালচলন অবলম্বন করবে, তাদের নিদর্শনাবলিকে মহব্বত করবে, তাদের উৎসবাদি পালন করবে, তাদের ধর্মীয়, সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে পছন্দ করবে; তার যবান থেকে কীভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বের হবে?

যেমন হবে কবরের সেই চাপ

ইসলামি পরিভাষায় 'কবরের চাপ' বলতে- মৃত্যুর পর কবরে শোয়ানোর পর মাটির সংকোচন বা চাপ দেওয়াকে বোঝায়, যা হাদিস অনুযায়ী সকল মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটবে। এটি মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্যম্ভাবী একটি মুহূর্ত, যা মানুষের পার্থিব কর্মের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। এটি এমন এক তীব্র আলিঙ্গন বা চাপ, যা দুনিয়ার সাধারণ কষ্টের সাথে তুলনীয় নয়।

কবরের চাপের মূল বৈশিষ্ট্য ও বিবরণ:

কোনো মানুষই এই চাপ থেকে রেহাই পাবে না— না সৎ ব্যক্তি, না অসৎ ব্যক্তি। মুমিন বা নেককার বান্দাদের জন্য এই চাপটি হবে খুবই সাধারণ, ক্ষণস্থায়ী ও স্নেহপূর্ণ। তাদের ক্ষেত্রে এই চাপটি হবে মায়ের স্নেহের মতো, যা কেবল তাদের একত্রিত করে প্রশান্তি দেবে। অন্যদিকে, কাফের ও পাপীদের ক্ষেত্রে এই চাপটি হবে অত্যন্ত ভয়ংকর, যার ফলে একদিকের পাঁজরের হাড় অন্যদিকের পাঁজরের হাড়ের ভেতরে ঢুকে যাবে। তবে পাপীদের ক্ষেত্রে তাদের গুনাহের পরিমাণ অনুযায়ী এই চাপের তীব্রতা কম-বেশি হয়। সাহাবি ও তাবেয়িরা এই কবরের চাপকে অত্যন্ত ভয়ংকর মনে করতেন এবং এর থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে সর্বদা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

মুহাম্মদ আত-তাইমি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কথিত আছে যে, কবরের চাপ মূলত চাপ প্রয়োগকৃতদের মা। তার গর্ভ থেকেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তারা তার কাছ থেকে বহু দূরে হারিয়ে গেছে। ফলে তার সন্তানদেরকে যখন তার নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তখন কবরের চাপ তাদেরকে এমনভাবে চেপে ধরে, যেমনিভাবে মমতাময়ী মা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তান ফিরে আসলে তাকে বুকে চেপে ধরে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আনুগত্য করবে কবর তাকে আস্তে ও কোমলভাবে চাপ দেবে। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ পাকের অবাধ্য হবে সে তার প্রতি আক্রোশ বশত সজোরে চাপ দেবে।
(শারহুস সুদুর, ইমাম সুযুতি: ১০৬)

হযরত ইবনু উমর (রা:) বলেন, যখন রাসুল (সা:) তাঁর কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা:) দাফন করলেন, তখন তার কবরের নিকট বসলেন। অতঃপর তার চেহারা ধূসরবর্ণের হয়ে গেল, তারপর তার চেহারায় আনন্দ প্রস্ফুটিত হলো। তখন তাঁর সাথিগণ তাঁকে এই সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বলেন, আমার কন্যার বিষয়টি এবং তার দুর্বলতা ও কবরের আজাবের বিষয়টি আমার স্মরণ হলো, অতঃপর আমি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দু'আ করলাম। ফলে তিনি তার কষ্ট লাঘব করে দিলেন। আল্লাহর কসম। নিশ্চয়ই তাকে এমন একটি চাপ দেওয়া হয়েছে যা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মাঝে যা কিছু আছে সবাই শুনতে পেয়েছে। (শারহুস সুদুর, ইমাম সুয়ুতি: ১০৫)

কবরের আযাব: এক অনস্বীকার্য সত্য বাস্তবতা

কবরের আযাব হলো মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বারযাখ বা মধ্যবর্তী জীবনের এক অনস্বীকার্য ও মহাসত্য বাস্তবতা। পার্থিব জীবনে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিরা কবরে সমাহিত হোক বা না হোক, তাদের মন্দ আমলের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এই অন্তর্বর্তীকালীন শাস্তি বা শান্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غير الحقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُون

অর্থ: আর আপনি যদি দেখতেন, যখন জালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর থাকবে আর ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও, আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।
(সূরা আনআম, আয়াত: ৯৩)

এর ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহি.) মৃত্যুর পর পর শাস্তির ঘোষণাকে কবরের আযাব বলে উল্লেখ করেছেন।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ

অর্থ: অচিরেই তাদের আমি দুইবার (বারবার) শাস্তি দেব। পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহা শাস্তির দিকে।
(সূরা তাওবা, আয়াত: ১০১)

এখানে দুইবার শাস্তির ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহি.) বলেন, প্রথম বার হলো কবরের আযাব।

অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

অর্থ: আর নিকৃষ্ট কঠিন শাস্তি ফেরআউন গোষ্ঠীকে ঘিরে ফেলল, সকাল সন্ধ্যায় তাদের উপস্থিত করা হয় জাহান্নামের সামনে, আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ফেরআউন গোষ্ঠীকে কঠিন শাস্তিতে প্রবিষ্ট করো।
(সূরা মুমিন, আয়াত: ৪৫-৪৬)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল কাসির এ বলেন, এই আয়াতটি আলমে বারযাখ তথা কবরজগতে শাস্তির প্রমাণ বহন করে।

নাস্তিক ও অবিশ্বাসীরাই কেবল কবরের আযাব ও সুখ-শান্তিকে অস্বীকার করেছে। তাদের কথা হলো, আমরা কবর খনন করলে তাতে ফেরেশতা দেখি না এবং মৃতদেরকে পিটাতেও দেখি না। সেখানে সাপ-বিচ্ছু দেখি না এবং আগুনও জ্বলতে দেখিনা।

আসলে কবরের প্রশস্ততা, সংকীর্ণতা, কবরের আলো, সবুজ-শ্যামল পরিবেশ কিংবা তার আগুন এ নশ্বর জগতের জ্ঞাত-পরিচিত জিনিস সমূহের মতো নয়। আল্লাহ তা'য়ালা এ দুনিয়াতে কেবল এর মধ্যকার জিনিসগুলো দেখিয়েছেন। আর আখিরাতের বিষয়গুলোর উপর পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছেন। সেটি আখিরাতের আগুন কিংবা শান্তিময় অবস্থা। সেটি দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ভয়াবহ। দুনিয়াবাসীরা সেটার উত্তাপ পাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা কবরবাসীর উপরের মাটি-পাথর এবং তার নিচের মাটি-পাথর উত্তপ্ত করেন। তা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে বেশি গরম হয়। যদিও জমিনবাসীরা যদি সে মাটি-পাথর স্পর্শ করে, তা অনুভব করে না। আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতা এর চেয়ে অধিক সুপ্রশস্ত ও বিস্ময়কর।

তবে আল্লাহ তা'য়ালা যখন ইচ্ছা তার কতিপয় বান্দাকে কবরের আযাব বা সুখ-শান্তি দেখাতে পারেন এবং অন্যদের থেকে সেটা গায়েব রাখেন। তিনি যদি সমস্ত মানুষকে কবরের আযাব দেখাতেন, তাহলে শরীয়তের আদেশ-নির্দেশ মানা এবং গায়েবের প্রতি ঈমান আনয়নের হিকমত ছুটে যেতো। লোকেরা মরা লাশ দাফনও করতো না।

কবরের আযাব হলো বারযাখী জগতের আযাব। বারযাখী জীবনে আযাবের হকদার প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই তার অংশ ভোগ করবে। তাকে কবরস্থ করা হোক বা না হোক। তাকে হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলুক অথবা আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত করে দেয়া হোক। তাকে পিষে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হোক বা ক্রুশবিদ্ধ করা হোক অথবা সাগরে ডুবে যাক কিংবা মাছের পেটে চলে যাক। তার রূহ ও দেহের মধ্যে ঐ শাস্তিই গিয়ে পৌঁছাবে, যা কবরস্থ মৃত ব্যক্তির রূহ ও দেহের মধ্যে পৌছে থাকে। এমনি তাকে বসানো এবং তার একপাশের পাজরের হাড্ডি অন্যপাশের পাজরের হাড্ডির মধ্যে ঢুকে পড়ার বিষয়টিও অনুরূপ।

সুতরাং যে ব্যক্তি কবরের আযাব ভোগ করার হকদার এবং যে তার সুখ-শান্তি উপভোগ করার যোগ্য, তার জন্য তা সাব্যস্ত হওয়া এবং এটি বিশ্বাস করা আবশ্যক।

কবরের আযাবের কারণ

কবর আযাব একটি সত্য বিষয়। কবরে মানুষের পাপ ও গুনাহের কারণে শাস্তি হয়ে থাকে। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ গুনাহগার, এজন্য অধিকাংশ মৃতব্যক্তিই কবরে শাস্তি ভোগ করে। কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা খুবই কম। হায়! বাহ্যত কবরের ওপর মাটি আর মাটি, অথচ তার ভেতর আযাব এবং পেরেশানীতে পরিপূর্ণ।

হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, কবরের আযাব হৃদয়, চক্ষু, কান, মুখ, জিহ্বা, পেট, লজ্জাস্থান এবং সকল অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের কারণে হয়ে থাকে। হযরত মাইমুনা সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেছেন: "হে মাইমুনা! তুমি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই কবরের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির কারণ গিবত এবং পেশাবের ফোঁটা।"
(শারহুস সুদুর, ইমাম সুযুতি: ১৪৮)

কবরের আযাবের কারণসমূহ:

১. আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
২. আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যা করা।
৩. শিরকে লিপ্ত হওয়া।
৪. ফেতনা সৃষ্টি ও বিদায়াত চালু করা।
৫. একজনের কথা অন্যকে বলে বেড়ানো, যাতে ঝগড়া সৃষ্টি হয়।
৬. মিথ্যা কথা বলা।
৭. সুদ খাওয়া, সুদের সাক্ষ্য প্রদান করা ও সুদ সংক্রান্ত লেখালেখি করা।
৮. অন্যায়ভাবে এতিমের মাল ভক্ষণ করা।
৯. নামাজের ওয়াজিবগুলো আদায় না করে নামাজ পড়া; বরং মুরগীর ন্যায় ঠুকরিয়ে নামাজ আদায় করা।
১০. মদ পান করা।
১১. যিনা করা।
১২. চুরি করা।
১৩. ধোঁকা দেওয়া।
১৪. হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া।

১৫. শরীয়ত বিরোধী আইন কামনা করা ও তা দ্বারা বিচারের রায় প্রদান করা।
১৬. হারাম গান-বাজনা করা।
১৭. বিক্রি করার সময় ওজনে কম দেওয়া এবং ক্রয় করার সময় বেশি নেওয়া।
১৮. অহংকার করা।
১৯. রিয়া করা।
২০. অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা।
২১. সৎ ও চরিত্রবান মহিলা/পুরুষের ওপর অপবাদ দেওয়া।
২২. আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করা।
২৩. গালি দেওয়া।
২৪. নিজের গুনাহের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে অন্যের দোষ তালাশে লেগে থাকা।
২৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।
২৬. যাকাত সন্তুষ্টচিত্তে আদায় না করা।
২৭. মানুষের সাথে অসদাচরণ করা।
২৮. গুনাহের উপর গর্ব প্রকাশ করা।
২৯. সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া, যদ্দরুন মানুষ তাকে ভয় করে।
৩০. অন্যায়ভাবে মুসলমানদের সম্পত্তি হস্তগত করা।
৩১. জাদু, কুফরি কাজে লিপ্ত থাকা।

এছাড়া আবু হুরায়রা (রা:) সূত্রে বর্ণিত; রাসূল (সা:) বলেছেন,

"তোমরা পেশাবের ছিটা ফোঁটা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা কবরের অধিকাংশ আজাবই এর কারণে হয়ে থাকে।"
(শারহুস সুদুর, ইমাম সুযুতি: ১৪৫)

উপরোক্ত সবগুলোই গুনাহের কাজ এবং প্রত্যেক গুনাহগার ব্যক্তিই কবরের আযাব ভোগ করবে। গুনাহের তারতাম্যের কারণে কবরের আযাবের মধ্যেও তারতম্য ঘটবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুক, আমীন।

কবরে নেক বান্দাদের অবস্থা ও পাপীদের আযাব

কুরআন ও হাদীস থেকে সংগৃহীত কবরে মানুষের অবস্থা নিয়ে বিবরণ দেওয়া হলো-

মৃত ব্যক্তিরা যা কিছু শুনে

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,
"মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর সঙ্গী-সাথীরা যখন সেখান থেকে বাড়ি ফিরতে থাকে, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়।"
(মিশকাত ১২৬)

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সা:) এভাবে নাম ধরে ডেকে বলেছিলেন,

"হে আবু জাহল..., হে উমাইয়া... তোমরা আজ তোমাদের পরিণতি দেখলে তো? ..." এরপর রাসূল (সা:) সাহাবাদের এও বলেছিলেন,

"আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এরা আমার এসব কথা এমনভাবে শুনছে যাদের মতো তোমরাও শুনছো না।" এরপর তাদের লাশ আবর্জনাময় কূপে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।
(সহীহ বুখারী, মুসলিম: ২৮৭০)

দাফনের পর বান্দাকে জান্নাত ও জাহান্নাম দু'টোই দেখানো হয়

দাফন শেষে লোকজন ফিরে যেতে না যেতেই দু'জন ফেরেশতা চলে আসে, অতঃপর তাকে উঠিয়ে বসায়। তার উত্তর সঠিক হলে প্রথমে জাহান্নাম এবং পরে জান্নাত এ দু'টো জায়গাই তাকে দেখানো হয়। অতঃপর বলা হয়, তুমি পাপী হলে ঐ জাহান্নামে তোমাকে ঢুকানো হতো। কিন্তু তোমার ভালো আমলের কারণে ঐ জাহান্নাম থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে নেয়ামতে ভরা জান্নাতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।
(সহীহ বুখারী: ১২৭৩)

মৃত ব্যক্তি যদি কাফের হয়, তবে সে তখন ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠে বসে।

নেক বান্দার কবরের প্রশস্ততা

নেক বান্দা যখন প্রশ্নের উত্তর সঠিক দেয় তখন তার কবরকে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৭০ হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। অন্য এক হাদীসে আছে, জান্নাতের দিকে খোলা দরজা দিয়ে কবরে সুগন্ধি আসতে থাকে এবং তার কবরকে তার দৃষ্টি যতটুকু যায় ততটুকু পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।
(তিরমিযী: ১০৭১)

কবরের জীবনের সঙ্গী

মুমিন বান্দার কবরকে তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়ার পর তার কাছে এক সুদর্শন চেহারাবিশিষ্ট ও সুগন্ধওয়ালা একজন লোক এসে কবরস্থ মুমিন লোককে বলে, তোমাকে প্রফুল্ল করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ করো। আর এ দিনের ওয়াদাই তোমাকে দেওয়া হয়েছিলো। কবরবাসি জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তোমার চেহারা এতো সুন্দর! এতো কল্যাণের বার্তা তুমি নিয়ে এসেছো? উত্তরে সে বলে, আমি হলাম তোমার নেক আমল।

পক্ষান্তরে, কবরে অমুসলিম, কাফির, মুনাফিক ও পাপী মুসলিম বান্দার কাছে অতিশয় কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট নোংরা বেশে দুর্গন্ধযুক্ত একজন লোক এসে বলে, তুমি আজ এমন দুঃসংবাদ গ্রহণ করো যা তোমাকে ভারাক্রান্ত করবে। আর এমন ওয়াদাই দুনিয়ায় তোমাকে দেওয়া হয়েছিলো। কবরওয়ালা তখন জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? কী বীভৎস কুৎসিত তোমার চেহারা! যা অশুভ সংবাদ বয়ে আনে? সে তখন উত্তর দেয়, আমি হলাম তোমার বদ আমল।
(মিশকাত: ১৫৪২)

আগুনের সুড়ঙ্গ

পাপী বান্দারা যখন পাপের অভিশাপে ফেরেশতাদের কোনো প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারে না। তখন তাকে প্রথমে জান্নাতের নিয়ামতরাজির দৃশ্য দেখানো হয়। অতঃপর বলা হয়, তুমি যদি ভালো কাজ করতে তাহলে আজ এখানে হতো তোমার ঠিকানা। কিন্তু তা তুমি করোনি।

এরপরই জাহান্নামের দিকে একটি পথ তার জন্য খুলে দেওয়া হয়, যার আগুনের ফুল্কি একে অপরকে দলিত-মথিত করে তুলছে। বলা হয়, এটা হলো এখন তোমার স্থান, যেখানে কিয়ামত পর্যন্ত থাকতে হবে।
(মিশকাত: ১৩৯)

কবরে আলো কিংবা অন্ধকার

আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, মুমিন ব্যক্তি কবরে একটি সবুজ বাগানে থাকবে। তার কবরকে পূর্ণিমার রাতের মতো আলোকিত করা হবে।
(তারগীব অত-তারহীব: ৩৫৫২)

আরেক হাদীসে আছে, ভালো আমলের কারণে কবরকে আলোকিত করা হয় এবং মন্দ আমলের কারণে কবরকে করে দেওয়া হয় অন্ধকার।
(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা)

একবার মসজিদের এক ঝাড়ুদার মহিলাকে ক'দিন না দেখে তার সম্পর্কে নবী (সা:) জানতে চাইলেন। তারা বললেন, এ মহিলা মারা গেছে। নবীজি (সা:) বললেন, ঘটনাটি আমাকে জানাওনি কেনো? উত্তরে তারা জানালেন যে, বিষয়টি তারা সাধারণ ব্যাপার মনে করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা:) তার কবরের পাশে গেলেন, জানাযা পড়লেন। অতঃপর বললেন, এখানকার লোকগুলোর কবর অন্ধকারচ্ছন্ন ছিলো। আমার দু'আর কারণে আল্লাহ এগুলোকে এখন আলোকিত করে দিয়েছেন। (বুখারী: ৪৫৮)

নেক বান্দাদেরকে ঘুমিয়ে থাকতে বলা হয়

সওয়ালের জওয়াব যখন শুদ্ধ হয় তখন তাকে বলা হয়, তুমি এখানে ঘুমিয়ে থাকো। এ নেক বান্দাটি তখন বলে, আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে এ সুসংবাদটি তাদের জানিয়ে দিতে চাই। ফেরেশতাগণ তখন বলবেন এ সুযোগ আর নেই, তুমি এখানে বাসর ঘরের বরের মতো ঘুমিয়ে থাকো, যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত কেউ ঘুম থেকে জাগাতে পারবে না। সে পর্যন্ত তুমি এখানে ঘুমিয়ে থাকো।
(তিরমিযী: ১০৭১, মিশকাত: ১৩০)

কবরের মারপিট ও চিৎকার

মুনাফিক, কাফির ও পাপীদেরকে কবরে জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি কি আল্লাহর কিতাব কুরআন পড়োনি? এ বলেই লোহার হাতুড়ি দিয়ে এমনভাবে পিটাতে শুরু করে যার কারণে সে বিকট আওয়াজে চিৎকার করতে থাকে। আর এ চিৎকার এতো জোরে হয়, যা মানুষ ও জিন ছাড়া বাকি সবাই শুনতে পায়।

অপর এক হাদীসে আছে, জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি আল্লাহর কিতাব কুরআ জানার চেষ্টা করোনি কেন? এই বলে হাতুড়ি দ্বারা পেটাতে থাকবে।

আহমাদের এক হাদীসে আছে, যে বান্দা কবরে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না, তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়, যার সাথে থাকে একটি লোহার হাতুড়ি। এই হাতুড়ি দিয়ে ফেরেশতা গোনাহগার লোকটিকে অতিশয় জোরে আঘাত করতে থাকে। আর ঐ আঘাতের চোটে সে এমন জোরে চিৎকার করে যার আওয়াজ শুধু মানুষ আর জিন জাতি ছাড়া পূর্ব-পশ্চিমের বাকি সবাই শুনতে পায়। প্রতিটি আঘাতের সাথে সে মাটির সাথে মিশে যায়, অতঃপর আবার তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়, এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকে।
(মিশকাত: ১২৬, বুখারী: ১২৭৩)

চতুষ্পদ জন্তুরা কবর থেকে আসা চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পায়

মদিনায় দুই বৃদ্ধা ইহুদী মহিলার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা:) একদিন বলেছিলেন,

"কবরে পাপীদেরকে এতো কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়, যার আওয়াজ সকল চতুষ্পদ জন্তু ও প্রাণীরা শুনতে পায়।"

আয়েশা (রা:) বলেন, "এরপর থেকে রাসূল (সা:)-কে এমন কোনো সালাত আদায় করতে দেখিনি যার শেষে তিনি কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইতেন না।"
(বুখারী: ৫৮৮৯, নাসাঈ: ২০৪০)

রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও একবার এক ইহুদীর কবরে আযাবের আওয়াজ শুনেছেন।
(বুখারী: ১২৮৬)

হঠাৎ খচ্চর লাফিয়ে উঠার ঘটনা

যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন,

একবার নবী (সা:) একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরাও তখন তার সাথে ছিলাম। দেখলাম, হঠাৎ তখন খচ্চরটি লাফাতে শুরু করলো, এমনকি তখন রাসূল (সা:) খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার অবস্থা। তিনি তখন জানালেন, এখানে ইহুদী লোকটির কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে।
(মুসলিম: ২৮৬৮, বুখারী: ১২৮৬)

যে কারণে কবরের আযাব মানুষ শুনে না

নবী (সা:) বলেছেন,

"কবরের আযাবের ভয়ে তোমরা কবর দেওয়া বন্ধ করে দেবে, এ আশঙ্কা না হলে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করতাম, যেনো তিনি তোমাদেরকে কবরের আযাবের আওয়াজ শুনিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা জাহান্নামের আযাবের আওয়াজ থেকে আশ্রয় চাও, কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাও, গোপন ও প্রকাশ্য ফিতনা হতে আশ্রয় চাও, দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাও।" সাহাবারা সকলে প্রতিবারেই এগুলো থেকে আশ্রয় চাইলেন।

(মিশকাত: ১২২, মুসলিম)

কখন অমুসলিম ও কাফেরদের আযাব শুরু হয়?

রূহ কবজ করার পরপরই প্রত্যেক অমুসলিম বা কাফেরকে আযাবে নিক্ষেপ করে দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

অর্থ: তুমি যদি সত্যিই সেই করুণ অবস্থা দেখতে পেতে, যখন আল্লাহর ফেরেশতারা কাফেরদের রূহ বের করে নিয়ে যাচ্ছিলো, ফেরেশতারা তখন তাদের চেহারায় ও পিঠে একের পর এক আঘাত করে যাচ্ছিলো এবং বলছিলো, তোমরা আজ আগুনের আযাব ভোগ করো।
(সূরা আনফাল, আয়াত ৫০)

আযাব কতোবার হবে?

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

"মুনাফিকদের দুই বার আযাব দেওয়া হবে। একবার দুনিয়ায়, আরেকবার কবরে।"
(ফতহুলবারী- ৩/পৃ. ২৩৩)

মুনাফিক হলো ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে মুসলিম দাবি করে, অথচ অন্তরে সে ইসলামবিদ্বেষী।

করব দেখে উসমান (রা)-এর প্রতিক্রিয়া

উসমান (রা:) যখন কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন কান্নায় তাঁর দাড়ি ভিজে যেতো।

কবর দেখলেই এতো বেশি কান্না কেনো করতেন, এমন এক প্রশ্নের জবাবে উসমান (রা:) বলেছিলেন,

"এটা হলো আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি। এখানে মুক্তি মিললে পরকালেও মুক্তি। আর কবরে মুক্তি না পেলে পরকালের অবস্থা আরো কঠিন ও জটিল হবে।"

নবী (সা:) এও বলেছেন যে,

"কবরের চেয়ে ভয়াবহ আর কোনো স্থান দেখিনি।"
(মিশকাত: ১৩২)

কিয়ামত হওয়া; না হওয়ার আবেদন

মৃত ব্যক্তি মুমিন হলে প্রথম ঘাঁটি কবরেই নেয়ামতরাজি দেখে দু'আ করবে, 'হে রব! কিয়ামত দ্রুত সংঘটিত করে দাও, যাতে আমি দ্রুত আমার পরিবার ও সম্পদের নিকট ফিরে যেতে পারি।'

বিপরীতে কবরস্থ ব্যক্তি অমুসলিম, কাফির বা পাপাচারী হলে কবরের ভয়াবহ আযাব ও আখিরাতের আযাবের দৃশ্য দেখে দু'আ করবে, 'হে রব! কিয়ামত ঘটাইও না।'
(মুসনাদে আহমাদ: ১৭৮৭২)
কেননা, ঐ শাস্তি আরো ভয়ংকর।

মুরতাদের লাশ কবর গ্রহণ করে না

ইসলাম ছেড়ে দিয়ে যে লোক অন্য ধর্ম গ্রহণ করে সে হলো মুরতাদ। এ কাজটা এতো ভয়ানক যে, উক্ত ব্যক্তির লাশ কবর গ্রহণ করে না।
(সহীহ বুখারী: ৩৬১৭)

কবরের আযাব থেকে দূরে থাকবে যারা

কবরের আযাব থেকে তারাই দূরে থাকবে, যারা দুনিয়াতে খাঁটি ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে জীবনযাপন করেছে এবং কবিরা গুনাহ ও অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থেকেছে।

নবী কারীম (সা:) ইরশাদ করেছেন, “সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, মাইয়্যেতকে কবরে রাখার পর যখন লোকেরা ফিরে আসতে থাকে, তখন সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। যদি যে মুমিন হয় তাহলে নামাজ তার মাথার দিকে এবং রোযা ডান পাশে দাঁড়ায়, যাকাত বাম পাশে এবং তার নফল আমল তথা সাদকা, নফল নামাজ, দান-খয়রাত কল্যাণকর কাজের সওয়াব, মানুষের সাথে সদাচরণ ইত্যাদি পায়ের দিকে এসে দাঁড়ায়।

যদি মাথার দিক থেকে আযাব আসতে থাকে, তাহলে নামাজ বাধা দিয়ে বলে ‘এদিক থেকে যাওয়া যাবেনা’। যদি ডান দিক থেকে আযাব আসতে থাকে, তাহলে রোজা বাধা দিয়ে বলে, ‘এদিক থেকে যেতে পারবে না’। যদি বাম দিক থেকে আযাব আসতে থাকে, তাহলে যাকাত নিষেধ করে বলে, ‘এদিক দিয়েও জায়গা পাবে না’। তারপর যদি পায়ের দিক থেকে আযাব আসতে থাকে, তাহলে তার নফল আমলসমূহ বলে, ‘এদিক দিয়ে যাওয়া যাবেনা’।
(তারগীব)

এছাড়া হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তি ও বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ কবরের শাস্তি ও ফিতনা থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবেন।

যাঁরা কবরের আযাব থেকে মুক্ত থাকবেন:

১. যারা ইসলামী রাষ্ট্রের ভূখন্ড বা সীমান্ত পাহারায় থাকেন।
২. যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছেন।
৩. যারা রাতে নিয়মিত 'সূরা মুলক' তেলাওয়াত করেন।
৪. জুমার দিন মৃত্যুবরণকারী।
৫. যারা পেটের পীড়ায় বা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।
৬. নাবালক শিশু এবং মায়ের গর্ভে মৃত শিশু।
৭. পাগল ও বোকা

সালাফদের চোখে দেখা কবরের বিভিন্ন অবস্থা

কবরের জগৎ সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের আলোকে সালাফগণ কবরের বিভিন্ন অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, যা মানুষের মাঝে পরকালের ভয় ও দুনিয়াবিমুখতা তৈরি করে। সালাফদের অনেকে স্বপ্নের মাধ্যমে নেককারদের কবর এবং তাদের ইবাদত করতে দেখতে পান।

১. হাম্মাদ বিন যায়িদ বর্ণনা করেন, তুফাওয়াহ বংশের জনৈক ব্যক্তি বলেন,

"আমরা এক ব্যক্তিকে দাফন করলাম। পরে একটি বিষয় ঠিকঠাক করার জন্য আবার কবর খুঁড়তে গেলাম। গিয়ে দেখি মৃতদেহটি কবরে নেই।
(শরহুস সুদূর, ১৯৭)

২. ইয়াজিদ বিন তরীফ বাজালী বলেন, যামাযিম যুদ্ধের সময় আমার এক ভাই মৃত্যুবরণ করে। তাকে কবর দেওয়ার পরে আমি তার কবরে মাথা ঠেকিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করি। আমি আমার বাম কানে ভাইয়ের দুর্বল কণ্ঠের আওয়াজ শুনে চিনতে পারি। সে তখন বলছিল, আল্লাহ। এরপরই তাকে আরেকজন প্রশ্ন করল, তোমার দ্বীন কী? সে বলল, ইসলাম।
(তাহযীবুল আছার মুসনাদু উমর, ২/৫১৩, বর্ণনা নং ৫৩৬)

৩. আলা বিন আবদুর কারীম বলেন, এক লোক মারা গেল। তার এক ভাই ছিলেন, যিনি চোখে কম দেখতেন। তিনি বলেন, ভাইয়ের দাফনের পর লোকজন যখন চলে গেল, আমি কবরে মাথা রাখলাম। আমি কবরের ভেতর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, তোমার রব কে? তোমার নবী কে? এরপরই আমি আমার ভাইয়ের পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সে বলছিল, আল্লাহ আমার রব। মুহাম্মাদ আমার নবী। তারপর কবরের ভেতর থেকে তির ছুড়ে যাওয়ার মত শাঁ শাঁ শব্দ বের হতে লাগল। এই আওয়াজ শুনে আমার শরীর হিম হয়ে গেল। আমি ফিরে আসলাম।
(ইরশাদুস সারী, ৩/৪৭৮, ১৩৭৪ নং)

৪. মুহাম্মাদ বিন মুসা সাইগ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন নাফি মাদানী বলেন, মদিনাবাসী জনৈক ব্যক্তির ইন্তিকাল হলে তাকে যথারীতি দাফন করা হয়। এক ব্যক্তি স্বপ্নে তাকে জাহান্নামীদের মধ্যে দেখতে পায়। এই অবস্থা দেখে সে খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। এর সাত বা আট দিন পর লোকটি তাকে আবার স্বপ্নে দেখে। এবার তাকে জান্নাতে দেখতে পায়। লোকটি তাকে বলল, তুমি না বলেছিলে, তুমি জাহান্নামী?

কবরবাসী বলল, আমি সেখানেই ছিলাম। আমাদের পাশে এক সালিহ (পুণ্যবান) ব্যক্তিকে দাফন করা হয়। তিনি তার আশেপাশের চল্লিশজনের জন্য সুপারিশ করেন। আমিও তাদের একজন।
(তবাকাতুল কুবরা লিইবনি সাআদ, ৭/১৭৪)

৫. রবী বিন সুবাইহ বলেন, ছাবিত বুনানী যখন ইন্তিকাল করলেন, আমি, হুমাইদ তঈল এবং আবু জাফর জাসর ইবনু ফারকাদ তার কবরে নামলাম। আমরা তাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে কাঁচা ইট দিয়ে কবর ঠিকঠাক করে দিচ্ছিলাম। হুমাইদ তঈল ছিলেন মাথার দিকে। হঠাৎ তিনি খেয়াল করলেন যে, ছাবিত বুনানী কবরে নেই। এ দৃশ্য দেখে তিনি ইশারায় আমাদের তা জানালেন। আমরা তাকে ইশারা করে লোকজনকে জানাতে নিষেধ করলাম। আমরা কবর ঠিকঠাক করে ফিরে আসলাম। ফিরে এসে হুমাইদ তঈল এ আমীর সুলাইমান বিন আলী (রা:) এর কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। পরদিন রাত্রি ঘনিয়ে এলে তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে সেখানে গিয়ে ইট সরিয়ে ছাবিত বুনানী এ-কে কবরে পেলেন না। কবরের মাটি সমান করে দিয়ে তিনি ফিরে আসলেন। সকালে আমরা সবাই ছাবিত বুনানী-এর মেয়ের কাছে গিয়ে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে আপনারা তাকে কবরে খুঁজে পাননি! বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু এর রহস্য কী? তিনি বললেন, পঞ্চাশ বছর যাবৎ তিনি শেষরাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে এই দুআ করতেন,

يَا رَبِّ، إِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ أَحَدًا الصَّلَاةَ فِي قَبْرِهِ فَأَعْطِنِيْهَا

অর্থ: হে আমার রব, আপনি যদি কবরে কাউকে নামায পড়ার সুযোগ দান করেন তবে আমাকেও সে সুযোগ দান করুন।

ইনশাআল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার এই দুআ ফিরিয়ে দেবেন না।

বর্ণনাকারী রবী বিন সুবাইহ বলেন, আবু জাফর জাসর বললেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই! আমি রাত্রিবেলা স্বপ্নে তাকে সবুজ পোশাকে কবরে নামায আদায় করতে দেখেছি।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৫২০; হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ২/৩১৯)

সালাফদের দেখা কবরের আযাব

সালাফ ও বুজুর্গদের যুগে এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেখানে মানুষ স্বপ্নে বা অন্তর্দৃষ্টি এর মাধ্যমে কবরের আযাব স্বচক্ষে দেখেছেন। এসব বর্ণনায় উঠে এসেছে কীভাবে পাপীদের কবরে শাস্তি দেওয়া হয়। কবরের আযাব ও বারযাখের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে সালাফ এবং সাহাবীরা প্রচণ্ড ভয় পেতেন। কুরআন তেলাওয়াত বা আলোচনার সময় কবরের শাস্তির আয়াত এলে তাঁরা ডুকরে কেঁদে উঠতেন এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাইতেন। সালাফরা সবসময় জানাজায় উপস্থিত হলে বা কবর জিয়ারত করার সময় পার্থিব জীবনের অসারতা উপলব্ধি করতেন এবং একে অপরের জন্য কবরের আযাব থেকে মুক্তির অসিয়ত বা নসিহত করতেন।

নিচে সালাফদের চোখে দেখা কিছু কবরের আযাব সম্পর্কে তুলে ধরা হলো-

১. ইমাম শাবী এ বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর রাসূল (সা:)-কে বললেন,

إِنِّي مَرَرْتُ بِبَدْرٍ فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَضْرِبُهُ رَجُلٌ بِمِقْمَعَةٍ مَعَهُ حَتَّى يَغِيبَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ مِرَارًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ يُعَذَّبُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"আমি বদর প্রান্তরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম মাটি ফুঁড়ে এক লোক উঠে আসছে। এমন সময় আরেকজন এসে হাতুড়ি দিয়ে তাকে আঘাত করল। আঘাতের তীব্রতায় সে মাটিতে দেবে অদৃশ্য হয়ে গেল। এভাবে কয়েকবার তার সাথে এমন ঘটনা ঘটে। সব শুনে রাসূল (সা:) বললেন, এই লোকটি হলো আবু জাহল বিন হিশাম। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এভাবেই শাস্তি দেওয়া হবে।"

(মুজামুল আওসাত লিত-তাবরানী, ৬/৩৩৫। রিওয়ায়াত নং ৬৫৬০। আরও রয়েছে: দালাইলুন নাবুওয়াতি লিল-বাইহাকী, ৩/৮৯, ৯০; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/২৮৯, ২৯০)

২. আমর বিন দীনার বলেন, সালিম বিন আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ বিন উমর ইবনুল খাত্তাব হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

"একবার আমি মক্কা-মদীনা সফর করছিলাম। পথিমধ্যে পানিভর্তি একটি ছোট পাত্র নিয়ে একটি কবরস্তানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় এক ব্যক্তি কবর হতে বের হয়ে আসল। তার গলায় বেড়ি পরানো। সে আমাকে বলল, হে আবদুল্লাহ, আমাকে পানি পান করান। হে আবদুল্লাহ, আমাকে সিক্ত করুন। আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পারলাম না, সে কি আমার নাম জানত নাকি আরবদের স্বাভাবিক রীতি হিসেবে আবদুল্লাহ তথা আল্লাহর বান্দা বলে ডাকছিল? এমন সময় আরেক ব্যক্তি উঠে এসে বলল, হে আবদুল্লাহ, তাকে সিক্ত করবেন না। তাকে পানি পান করাবেন না। অতঃপর তার গলার বেড়ি ধরে টেনে তাকে কবরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।"
(মান আশা বাদাল মাওতি, পৃ: ৩২)

৩. হিশাম বিন উরওয়াহ (রা:) তার পিতা উরওয়াহ বিন যুবাইর (রা:) এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একবার তিনি মক্কা-মদীনা সফর করছিলেন। পথিমধ্যে একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে হঠাৎ একটি কবর হতে লোহার বেড়ি জড়ানো অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় এক লোক বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসেই সে বলল, হে আবদুল্লাহ, আমাকে পানি পান করান। বারি সিক্ত করুন। ইতিমধ্যে তার পেছনে আরেকজন লোক বেরিয়ে এসে বলল, হে আবদুল্লাহ, আপনি তারে সিক্ত করবেন না। পানি দেবেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, এ দৃশ্য দেখে তিনি জ্ঞান হারিয়ে উটের পিঠ থেকে উল্টে পড়ে যান। তার জিনিসপত্র এদিক-সেদিক ছড়িয়ে রইল। সকালে যখন তার জ্ঞান ফিরল, তখন ধুলোবালিতে তার চুল সাদা হয়ে ছাগামাহ ঘাসের ন্যায় হয়ে যায়।

সফর শেষে খলীফা উসমান বিন আফফান (রা:) কে বিষয়টি জানালে তিনি একাকী সফর করতে নিষেধ করেন।
(আল-আহওয়াল, ৬৪ এবং ইবনুল কায়্যিম, ৯৪)

৪. আবু কুযআ বসরী (রা:) নিজের কিংবা অন্য একজনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"একবার আমরা আমাদের এলাকা ও বসরার মধ্যবর্তী জলাধারগুলোয় একটির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় আমরা বিকট স্বরে গাধার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমরা স্থানীয় একজনকে বললাম, এই ভয়ংকর আওয়াজটি কিসের? সে বলল, আওয়াজটি আমাদের এলাকার একজন মৃত ব্যক্তির। জীবদ্দশায় তার মা তাকে কিছু বললে উত্তরে সে বলত, তুমি অমন কর্কশ স্বরেই চ্যাঁচাতে থাকো। তার মৃত্যুর পর থেকে প্রতিরাতে তার কবর হতে এমন কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসে।"
(মান আ'শা বা'দাল মাওতি, ২৭। বর্ণনা নং ২৬)

৫. আমর বিন দীনার বলেন,
"মদীনায় এক লোক ছিল, যার একজন বোন থাকত মদীনার শেষ প্রান্তে। বোনটি নানা কষ্টে ভুগত। সে মাঝে মাঝে তার বোনকে দেখতে যেত। দেখে আবার ফিরে আসত। একসময় বোনটি মারা গেল। খবর পেয়ে লোকটি এসে জানাযার ব্যবস্থা করল। কবর পর্যন্ত বোনের লাশ নিয়ে গেল। যথাযথভাবে দাফন করে বাড়ি ফিরল। ঘরে ফিরে তার মনে পড়ল যে, কবরে নামার সময় ভুল করে তার মুদ্রার থলেটি সেখানে ফেলে এসেছে। থলেটি উদ্ধার করতে এক ব্যক্তির সাহায্য কামনা করলে সে এগিয়ে আসল। উভয়ে কবরস্থান গিয়ে কবরের মাটি কিছুটা সরাতেই থলেটি পেয়ে গেল। তখন ভাইটি বলল আরেকটু খুঁড়ে দেখো তো আমার বোনটার কী অবস্থা? একটু দেখি। কথামতো কবরের একটি ইট সরাতেই দেখা গেল, পুরো কবর আগুনের শিখায় দাউ দাউ করছে। ইটটি যথাস্থানে রেখে লোকটি তড়িঘড়ি তার মায়ের কাছে ফিরে আসল। মাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার বোনের অবস্থা কেমন ছিল বলুন তো। মা বললেন, তোমার বোনের কথা আর বোলো না। সে তো ধ্বংস হয়ে গেছে! ছেলে বলল, তার কী সমস্যা ছিল খুলে বলুন। মা বললেন, সে নামায আদায়ে খুব টালবাহানা করত। তা ছাড়া অযুর ব্যাপারে যথাযথ খেয়াল রাখত না। আর প্রতিবেশীরা শুয়ে পড়লে তাদের দরজায় কান পাতত। আড়ি পেতে শোনা কথাগুলো আবার মানুষের মাঝে বলে বেড়াত।"
(ইবনু কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ, ৬৭, ৬৮)

৬. হুসাইন আসাদী (রা:) বর্ণনা করেন, মারছাদ বিন হাওশাব (রা:) বলেন, "একবার আমি ইউসুফ বিন আমর (রা:)-এর নিকট বসা ছিলাম। তার পাশেই এক ব্যক্তি বসে ছিলেন, যার চেহারার এক পাশ লোহার মতো শক্ত ও সমান হয়ে আছে।

ইউসুফ (রা:) তাকে বললেন, তুমি যা দেখেছ, মারছাদকে তা খুলে বলো।

সে বলল, কুৎসিত এই ঘটনাটি যখন ঘটে তখন আমি যুবক। দেশে তখন প্লেগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ভাবলাম, শহরের কোনো এক প্রান্তে চলে যাই যেখানে লোকজনের দাফন হয়। এবং এসব কাজে অংশ নেওয়া যায়। যেই ভাবা সেই কাজ। এমনই একদিন আমি কবর খোঁড়ার কাজে মগ্ন ছিলাম। কাজ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ের কথা। আমি একটি কবর খুঁড়ে তার মাটি অন্য কবরের ওপর ফেলছিলাম। এমন সময় একজন পুরুষ মানুষের মৃতদেহ আনা হলো। তাকে দাফন করে মাটি দিয়ে লোকজন চলে গেল। লোকজন চলে যাওয়ার পরপরই পশ্চিম দিক হতে উটের মত বিশালাকৃতির ও সাদা বর্ণের দুটি পাখি উড়ে এল। একটি তার মাথার দিকে আর অন্যটি পায়ের দিকে এসে নামল। পাখি দুটি তাকে জাগিয়ে তুলল। একটি পাখি তার কবরে নেমে গেল। অন্যটি এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তখন আমার কর্মরত কবরের এক কোনায় চলনশক্তি হারিয়ে বসে ছিলাম। আমার মুখ এমনভাবে হা হয়ে ছিল, যেন কোনোভাবেই তা পূর্ণ হওয়ার মতো নয়। ইতিমধ্যে কবরে নামা পাখিটি মৃত ব্যক্তির হাতের ডান দিকে একটি ঠোকর মারল। আমি শুনতে পেলাম, পাখিটি তাকে বলছে, তুমি কি শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় দুটি ফিনফিনে মিসরীয় পোশাক গায়ে চাপিয়ে অহংকার করতে করতে যাওনি? লোকটি বলল, এ বিষয়ে আমি দুর্বল ছিলাম।

এ কথা বলতে পাখিটি তাকে আরেকটি ঠোকর মারল। এতে পুরো কবর পানি বা চর্বি-জাতীয় কিছুর ফেনায় ভরে উঠল। এভাবে তিনবার ঠোকর মারল। আর তিনবারই কবরে পানি বা চর্বি-জাতীয় কিছর ফেনা ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর মাথা উঠাতেই পাখিটির দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে।

আমাকে দেখেই সে বলে উঠল, আল্লাহ তার অকল্যাণ করুন! সে কোথায় বসে আছে দেখেছ? এই বলেই আমার চেহারার একপাশে ঠোকর মেরে বসল। ঠোকা খেয়ে আমি সারা রাত অচেতন অবস্থায় সেখানেই পড়ে রইলাম। সকালে হুঁশ ফেরার পর আমি নিজের এই অবস্থা দেখতে পেলাম। আর নিজের বসে থাকার কথা মনে করতে লাগলাম।
বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হুবহু এমন কিংবা কাছাকাছি কথা বলেছেন।
(আহওয়ালুল কুবুর, ১৮)

৭. আবু আবদুর রহমান বিন বুহাইর (রা:) বর্ণনা করেন,
"ইরাকের মুজিবিয় শহরের ছাগার নামক এলাকার হাসান বিন ফুরাত নামক জনৈক ব্যক্তি নিজের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একদিন তিনি আবু ইসহাক ফারাযি-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে কাফন-চোরদের তাওবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, যারা কবর খোঁড়ে, তাদের কি তাওবা করার কোনো সুযোগ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। নিয়ত যদি ঠিক থাকে তবে তার তাওবা কবুল হবে। আর তার সত্যতা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই অবগত আছেন।

লোকটি বলল, কবর খুঁড়তে গিয়ে আমি এমন অনেক লাশ দেখেছি, যাদের চেহারা কিবলা হতে ঘুরে গিয়েছে।

বিষয়টি সম্পর্কে আবু ইসহাক ফারাযি (রা:) এর সঠিক ধারণা না থাকায় তিনি ইমাম আওযাঈ (রা:) এর নিকট 'কাফন-চোরদের' বিষয়টি জানিয়ে পত্র পাঠালেন। জবাবে ইমাম আওযাঈ (রা:) লিখলেন, নিয়ত ঠিক থাকলে তার তাওবা কবুল হবে। আর নিয়তের সততার বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালাই ভালো জানেন। আর সে যে, বিভিন্ন মানুষের চেহারা কিবলা হতে ঘুরে যেতে দেখেছে; তারা হলো সেসব মানুষ, যারা সুন্নাতবিমুখ অবস্থায় মারা গিয়েছে।
(আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮; তাওয়াবীন, ২৮৩-২৮৫)

৮. আবদুল মুমিন বিন আবদুল্লাহ (রা:) বলেন, "এক কাফন-চোর তাওবা করে কবর খননের

কাজ ছেড়ে দেয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কবর খননকালে তোমার দেখা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা কী ছিল?

সে বলল, 'একবার আমি কবর খুঁড়ে একটি লাশ উঠালাম। লাশটির সারা দেহে পেরেক মারা ছিল। তার মাথায় একটি বড়সড় পেরেক ঠোকা ছিল। এমনি আরেকটি ছিল পায়ে।'

এমনিভাবে আরেক কাফন-চোরকে তার তাওবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল, একবার আমি একটি লাশ কবর থেকে তুললাম। সে সময় আমি তার চেহারা কিবলা হতে অন্য দিকে ঘুরানো অবস্থায় পেয়েছি।
(আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮)

৯. মুহাম্মাদ বিন উবাইদ (রা:) বর্ণনা করেন, আবুল হারীশ তার মায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "আব্বাসি খলীফা আবু জাফর মানসুর ১৩৬ হিজরিতে খিলাফত লাভ করে কুফার চারপাশে যখন পরিখা খনন শুরু করেন, লোকজন তখন পরিখাস্থল হতে নিজেদের মৃত স্বজনদের স্থানান্তর করেন। সে সময় এক মৃত যুবককে নিজের হাতে কামড় দেওয়া অবস্থায় দেখা যায়।"
(আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮)

১০. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম (রা:) বর্ণনা করেন, হুওয়াইরিছ বিন জুবাব (রা:) বলেন, "একবার আমি উটের পিঠে চড়ে অনেক পুরোনো ও বিশাল একটি গাছের নিচে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় পাশের একটি কবর হতে এক ব্যক্তি উঠে এল। যার চেহারা ও মাথায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। গায়ে লোহার পোশাক জড়ানো। বেড়িয়ে এসেই সে বলতে লাগল, আমাকে একটু পানি পান করান। পানি পান করান। এমন সময় তার পেছনে আরেক ব্যক্তি বেরিয়ে আসল। সে বলতে লাগল, এই কাফিরকে পানি পান করাবে না। বলেই সে তাকে ধরে ফেলল। পেছনে আসা লোকটি তার গায়ে জড়ানো শেকলের দু-প্রান্ত ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল এবং আমাদের সামনে দিয়ে দুজনই কবরে ঢুকে গেল। এ দৃশ্য দেখে আমার উট ঘাবড়ে গিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। আমি কোনোভাবেই তাকে বাগে আনতে

পারছিলাম না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে অবশেষে উটটি 'আরকুয যবইয়াহ' এলাকায় এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। আমি উটের পিঠ হতে নেমে মাগরিব ও এশার নামায আদায় করলাম। এরপর আবার উটের পিঠে উঠে সকালে মদীনায় আসলাম। মদীনায় আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা:)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ঘটনাটি বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, হুওয়াইরিছ, তুমি খুব বিস্ময়কর ঘটনা শোনালে! অবশ্য তোমাকে মিথ্যা বলার অপবাদ দিচ্ছি না।"

মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম (রহি.) বলেন, "এরপর উমর শহরের উভয় প্রান্তের ইসলামপূর্ব জাহিলী যুগ দেখা বয়স্ক লোকজনকে ডেকে পাঠালেন। লোকজন জমা হলে তিনি হুওয়াইরিছ-কেও ডেকে পাঠালেন। তিনি আসলে উমর (রা:) সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হুওয়ারিছের প্রতি আমি সন্দেহ পোষণ করছি না। তবে সে খুব আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনিয়েছে। হুওয়াইরিছ, তুমি আমাকে যা শুনিয়েছ, তাদেরও তা শোনাও। তিনি ঘটনাটি শোনালেন। ঘটনা শুনে উপস্থিত লোকজন বলে উঠল, আমীরুল মুমিনীন, আমরা লোকটিকে চিনতে পেরেছি। সে গিফার গোত্রের লোক। জাহিলী যুগেই তার মৃত্যু হয়েছে। উমর তার ব্যাপারে আরও কিছু জানতে চাইলে তারা বলল, সে জাহিলী যুগের প্রথা মেনে চলা লোকদের একজন ছিল। তবে সে আরব রীতি অনুসারে অতিথি আপ্যায়ন করত না।"
(মান আশা বাদাল মাওত, ৫০; বর্ণনা নং ৫৬)

১১. মুফাযযাল বিন ইউনুস জুফী (রহি.) বলেন,
"আমরা জানতে পেরেছি যে, একবার খলীফা উমর বিন আবদুল আযীয (রহি.) মাসলামাহ বিন আবদুল মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাসলামাহ, তোমার পিতা খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের দাফন-কাফনের কাজ কে করেছে?' মাসলামাহ (রা:) বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন, অমুক অমুক করেছে।'

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিককে কারা দাফন করেছে?' মাসলামাহ বললেন, 'অমুক অমুক'।

খলীফা বললেন, "তাদের সাথে যা ঘটেছে বলে আমি জেনেছি, তোমাকে তা বলি শোনো।

তাদের উভয়ের দাফনকারীগণ আমাকে বলেছে যে, তোমার পিতা আবদুল মালিক ও ভাই ওয়ালিদকে কবরে নামানোর পরে যখন কাফনের গিঁট খুলে দিতে লাগল; তখন দেখা গেল যে, তাদের চেহারা পেছন দিকে ঘুরে গিয়েছে।

মাসলামাহ, ভালো করে খেয়াল রাখবে। আমি যখন মৃত্যুবরণ করব, তুমি আমাকে দাফন করবে। আর সে সময় আমার চেহারার দিকে লক্ষ রাখবে। দেখবে যে, আমার অবস্থাও কি আপন লোকদের মতো হয়েছে নাকি আমি তা হতে নাজাত লাভ করেছি।"

মাসলামাহ বলেন, "উমর বিন আবদুল আযীয (রহি.)-এর ইন্তিকালের পর আমি তাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে চেহারার প্রতি লক্ষ করে দেখলাম যে, তার চেহারা ঠিক আছে।"
(আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮)

১২. আবু আবদুল্লাহ আবদুল মুমিন বিন আবদুল্লাহ মুসিলী (রহি.) বর্ণনা করেন, "ফিলিস্তিনের রামলা শহরের জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, একবার আমরা প্রবল ঝড়ো বাতাসের কবলে পড়লাম। বাতাসের ঝাপটায় কবরের মাটি পর্যন্ত সরে গেল। তখন আমি কিছু কবরবাসীকে কিবলা হতে মুখ ঘোরানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। মাত্র এগারো দিন আগে মৃত্যুবরণ করা এক বৃদ্ধ আমলদার লোকের কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি তার কবরের পাশে গিয়ে দেখলাম, তার চেহারা কিবলামুখী আছে। তবে তার নাকে সামান্য আঁচড়ের দাগ রয়েছে। তার সবকিছু ঠিকঠাক দেখে আমরা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করলাম।"
(আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮)

১৩. আবদুল মুমিন আরও বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, "আমার এক মেয়ের মৃত্যুর পর আমি তাকে কবরে নামালাম। কবর হতে উঠে সব ঠিকঠাক করার সময় একটি ইট ঠিক করতে গিয়ে দেখি, তার চেহারা কিবলা হতে ঘুরে গিয়েছে! ব্যাপারটা দেখে আমি একেবারেই ভেঙে পড়লাম। এই অবস্থাতেই একদিন তাকে স্বপ্নে দেখলাম। সে আমাকে বলল, বাবা, আমাকে এমন অবস্থায় দেখে তুমি ভেঙে পড়েছ? আমার আশেপাশের অধিকাংশ লোকের

চেহারাই কিবলা হতে ঘুরে গিয়েছে। তার কথায় মনে হলো, এই মানুষগুলো জীবদ্দশায় কবীরা গুনাহে লিপ্ত ছিল।"
(রূহ, ৯৭)

১৪. আবু উআইনাহ ইবনুল মুহাল্লাব (রহি.) বলেন, "আমি ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবকে বলতে শুনেছি, সুলাইমান বিন আবদুল মালিক খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমাকে ইরাক ও খুরাসানের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। সে সময় উমর বিন আবদুল আযীয আমাকে এই বলে সতর্ক করেন যে, ইয়াযিদ! আল্লাহকে ভয় করো। খলিফা ওয়ালিদের লাশ যখন আমি কবরে নামাই তখন কাফনের মধ্যেই সে ছটফট করছিল।
(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৫০৩-৫০৬)

১৫. সালাম তঈল বর্ণনা করেন, আমর বিন মাইমুন বলেন, আমি উমর বিন আবদুল আযীয এ-কে বলতে শুনেছি, খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিককে যারা কবরে নামিয়েছে, আমি তাদের একজন। তাকে কবরে নামানোর সময় আমি লক্ষ করলাম যে, তার দুই হাঁটু ভাঁজ হয়ে ঘাড়ের দিকে বাঁকা হয়ে আসছে। এই দৃশ্য দেখে তার এক ছেলে বলে উঠল, আল্লাহ, আমার পিতাকে আপনি শান্তি দান করুন। হে কাবার রব, আমার পিতাকে শান্তি দান করুন! তার কথা শুনে আমি বললাম, কাবার রবের কসম! তোমার পিতার জন্য সে সময় ফুরিয়ে গেছে।

পরবর্তী সময়ে উমর বিন আবদুল আযীয (রহি.) এই ঘটনা বলে মানুষকে উপদেশ দিতেন। (তারীখু দিমাশক, ৬৩/১৮০)

১৬. আবদুল হামীদ বিন মাহমুদ মিওয়ালি (র.) বলেন,
"একবার আমি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় একদল লোক এসে তাকে বলল, আমরা হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করে এসেছি। আমাদের একজন সফরসঙ্গী সিফাহ নামক স্থানে এসে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তার মৃতদেহ বহন করে কিছুদূর এগিয়ে যাই। এরপর সুবিধামতো জায়গা দেখে আমরা তার জন্য কবর খনন করি। কবর

খননের কাজ শেষ হতেই কবরে কালো বিষাক্ত সাপ কিলবিল করতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে আমরা সেখান হতে সরে অন্যত্রে আরেকটি কবর খনন করি। সেখানেও কবর খনন শেষ হতেই কালো বিষাক্ত সাপে কবর ভরে যায়। এখন তাকে ফেলে রেখে আমরা আপনার নিকট এসেছি। সব শুনে ইবনু আব্বাস বললেন, এটা হলো তার অপকর্মের ফলাফল। তোমরা গিয়ে তাকে কোনো একটি কবরে দাফন করে দাও। সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তার জন্য পুরো দুনিয়া খুঁড়ে ফেললেও এ রকম চিত্রই দেখতে পাবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা গিয়ে তাকে দাফন করে আসলাম। অতঃপর আমাদের সাথে থাকা তার জিনিসপত্র নিয়ে তার পরিবারের লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার স্বামীর কী এমন বদ আমল ছিল? তিনি বললেন, সে তৈরি খাবার বিক্রি করত। সে রোজ রোজ তার পরিবারস্থ লোকদের কামাই-রোজগার কেড়ে নিত। তাদের দিয়ে যব ভাঙিয়ে অন্যায়ভাবে তা খাবারে মিশিয়ে দিত।
(শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ৬/১২১৬; শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী, ৭/২৩২। বর্ণনা নং ৪৯২৮)

১৭. আবু ইসহাক সাহিবুশ শাত (র.) বলেন, "একবার আমাকে একটি লাশ গোসল করানোর জন্য ডাকা হলো। আমি মৃত ব্যক্তির চেহারা হতে কাপড় সরাতেই দেখলাম, একটি সাপ তার গলা পেঁচিয়ে আছে।"

তিনি বলেন, "আমি মৃতদেহের গোসল না সেরেই চলে আসি। লোকজন তখন বলাবলি করছিল যে, লোকটি সালাফদের গালিগালাজ করত।"
(আস সুন্নাতু লি ইবনি আসিম, ২/৪৮৩। বর্ণনা নং ১০০২)

১৮. হুসাইন বিন আলী (র.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَجَعَلَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِي زُمْرَةٍ فَيَلْقَى أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، فَيُصَافِحُونَهُمْ، وَيُعَانِقُونَهُمْ، وَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَقُولُونَ: إِخْوَانُنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَرَحَّمُونَ عَلَيْنَا،

وَيَسْتَغْفِرُونَ لَنَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا مِنْ أَحَدٍ خَارِجٍ مِنَ الدُّنْيَا شَاتِمًا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ دَابَّةً فِي قَبْرِهِ تَقْرِضُ لَحْمَهُ، فَيَجِدُ أَلَمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উম্মতকে একত্র করবেন; তখন মুহাম্মাদ (সা:) -এর উম্মতকে এমন এক স্থানে রাখবেন যেখানে পূর্ববর্তী উম্মতগণ এসে পরবর্তীদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারা একে অপরের সাথে মুসাফাহা করবে, মুয়ানাকা করবে এবং একে অপরকে সালাম জানাবে।"

পাশাপাশি তারা এ কথাও বলবে যে, এরা আমাদের সেসব ভাই, যারা পার্থিব জীবনে আমাদের প্রতি রহমতের জন্য দুআ করেছেন। আমাদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

রাসূল (সা:) আরও বলেছেন যে,
"তবে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারও প্রতি বিষোদগার করতে করতে মৃত্যুবরণ করবে; তার জন্য আল্লাহ একটি হিংস্র প্রাণী লেলিয়ে দেবেন, যা তার গোশত খুবলে খাবে। তার এই শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।
(আন-নাহিয়াতু আন ত'নি আমীরিল মুমিনিনা মুআবিয়া (দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ), ১/২০)

১৯. সাঈদ বিন খালিদ বিন ইয়াযিদ আনসারী বসরার জনৈক গোরখোদকের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "একদিন আমি একটি কবর খনন করলাম। কাজ সেরে পাশেই মাটিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দুজন মহিলা আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। তাদের একজন আমাকে বলল, হে আল্লাহর বান্দা, আমরা আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, এই মহিলাকে আমাদের নিকট হতে দূরে দাফন করুন। আমাদের তার প্রতিবেশী বানিয়ে দেবেন না! তিনি বলেন, এই স্বপ্ন দেখে আমি জেগে উঠি। কিছুক্ষণ পর জনৈকা মহিলার লাশ নিয়ে আসলে আমি লোকজনকে বলি, তার কবর তোমাদের পেছনে তৈরি করা হয়েছে। এই বলে আমি তাদের অন্য কবর দেখিয়ে দিই। রাত্রিবেলা আমি স্বপ্নে আবার সেই দুই মহিলাকে দেখতে পাই। তাদের একজন আমাকে বলল, আপনাকে আল্লাহ তা'য়ালা উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনি আমাদের দীর্ঘমেয়াদি অকল্যাণ থেকে রক্ষা করেছেন। আমি বললাম, ব্যাপার

কী? আপনি কথা বলছেন কিন্তু আপনার সঙ্গিনী কোনো কথা বলছে না! মহিলাটি বললেন, সে কোনো রকম অসিয়ত না করেই মারা গেছে। আর অসিয়ত ছাড়া মৃত্যুবরণকারীর জন্য নিয়ম হলো, সে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো কথা বলতে পারবে না।"

(আহওয়ালুল কুবুর, ১৬)

তবে অসিয়ত না করে মৃত্যুবরণ করলে কথা বলতে না পারা সম্পর্কিত কিছু হাদিস পাওয়া যায়। সেসব হাদিসের সনদও দুর্বল।

২০. আবু উসমান উমাওয়ি (র.) বলেন, আমি আমার পিতা ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (র.) এর নিকট বনু আসাদ গোত্রের গোরখোদকদের সম্পর্কে আবু বকর বিন আইয়াশ (র.) এর একটি ঘটনা শুনেছি। তিনি বলেন,

"একবার আমি একদল গোরখোদকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাদের একজন আমাকে বিন আইয়াশের বর্ণিত একটি ঘটনাটি শোনায়। সে বলে, আমি আর এক সঙ্গী, আমরা বনু আসাদের কবর খোঁড়ার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। এক রাতে একটি ঘটনা ঘটল। আমি একটি কবর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলাম। এক কবর হতে অন্য কবরবাসীকে উদ্দেশ্য করে কে যেন বলছে, হে আবদুল্লাহ!

উত্তর এল, বলো, জাবির!

প্রথমজন বলল, আমাদের মা মারা গিয়েছেন। তিনি আমাদের কাছে আসছেন।

দ্বিতীয়জন বলল, তাতে আমাদের কী লাভ? আমরা তো আর তার দ্বারা কোনো উপকারও পাচ্ছি না। বাবা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে শপথ করেছেন যে, তিনি তার জানাযা পড়বেন না।

তারা এভাবে কয়েকবার বলাবলি করল। তাদের কথা শুনে আমি আমার সঙ্গীর কাছে চলে এলাম। সেও তাদের কথোপকথন শুনতে পেয়েছে কিন্তু বোঝেনি। আমি তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে বললে সে বুঝতে পারে। পরের দিন এক লোক এসে আগের রাতে কথাবার্তা হওয়া কবর দুটি দেখিয়ে আমাকে বলল, এই দুই কবরের মাঝে আমার জন্য একটি কবর খুঁড়ে দিন। আমি কবর দুটি দেখিয়ে বললাম, এর নাম জাবির, আর ওর নাম কি আবদুল্লাহ? তিনি

বললেন, হ্যাঁ। আমি তাকে গতরাতে শোনা ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি শপথ করেছিলাম যে, তার জানাযা পড়ব না। তবে সেটা অন্যায় ছিল। আমি আমার কসমের জন্য কাফফারা দেব, তার জানাযা পড়ব এবং তার জন্য রহমতের দুআ করব। এই বলে তিনি চলে গেলেন। এ সময় তার হাতে একটি ছড়ি আর পানির পাত্র ছিল। তিনি আরও বলেন, আমি এই শপথের জন্য কাফফারা আদায় করা ছাড়াও হজের নিয়ত করলাম।"

(আল হাওয়াতিফ, ৫৬, বর্ণনা নং ৫৫)

কবর সম্পর্কে সালাফদের উপদেশ

উপদেশ-১:

মুফাজ্জাল ইবনু গাসসান বলেন,

“এক ব্যক্তি কবরস্থানের দিকে তাকালো এবং বললো, আমরা যে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী, তারা সে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে গেছে”।

(শারহুস সুদুর, ইমাম সুয়ুতি: ১১৯)

উপদেশ-২:

উমর ইবনুল খাত্তাব বর্ণনা করেন। রাসূল (সা:) বলেছেন,

مَا مِن ميّتٍ يُوضَعُ على سريره فيُخطى به ثلاث خُطى إِلَّا تَكَلَّمَ بكلام يسمعه من شاء اللهُ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ الجِنَّ والإنس، يقول: يا إخوتاه، ويا حملة نَعْشَاهُ، لا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنيا كما غَرَّتْني، ولا يَلعَبَنَّ بِكُمُ الزَّمانُ كما لعِبَ بي، خَلَفْتُ مَا تَرَكْتُ لِوَرَثَتِي وَالدَّيَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحَاسِبِي وَأَنْتُمْ تَشِيعُونِي وَتَوَدَعُونِي

“মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়াতে রেখে তিন কদম যাওয়ার আগেই মৃত ব্যক্তি এমন ভাষায় কিছু কথা বলে, যা মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত আল্লাহ তা’য়ালা যাকে শোনাতে চান সে শোনে। মৃত ব্যক্তি বলে, হে আমার ভাইয়েরা, আমাকে বহনকারী বন্ধুগণ, সাবধান! দুনিয়া আমাকে যেমন ধোঁকায় ফেলেছিল। তোমাদের যেন তেমন ধোঁকা দিতে না পারে। সময় আমাকে নিয়ে যে খেলা খেলেছে। তা যেন তোমাদের সাথে না খেলে। আমি যা অর্জন করেছি, আজ তা উত্তরাধিকারীদের হাতে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কিয়ামতের দিন হিসাবের দায়ভার আমাকেই নিতে হবে। তোমরা তো সামান্য সময়ের জন্য পেছনে চলে বিদায় দিতে আসছ!”

উপদেশ ৩:

উসমান বিন আবুল আস বলেন, আমি জনৈক ব্যক্তিকে আবৃত্তি করতে শুনেছি,

هل على نفس امرئ محزون موقن أنه غدا مدفون
فهو للموت مستعد لا يصون الحطام فيمن يصون

كلنا نكثر المذمة للدنيا وكل محبها مدفون
بأكثر الكنوز إن الذي يكفيك ما أكثرت منها الدون أترى من بها جميعا كان قد علقت منها
ومنك الرهون أين آباؤنا وأين آباؤهم قبل وأين القرون أين القرون
إنا لتلك المنايا ولو أنك في شاهق من تلك الحصون
كم أناس كانوا فأتتهم الأيام حتى كأنهم لم يكونوا
إن رأيا دعا إلى طاعة الله لرأيا باذل ميمون

অনুবাদ: তার হৃদয়ে কি এমন ব্যক্তির বসবাস আছে, যে এ বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিশ্বাসী যে, আগামীকাল তাকেও দাফন করা হবে? তাহলে তো সে যা কিছু সঞ্চয় করেছে তন্মধ্যে দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তু সঞ্চয় না করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। আমরা প্রত্যেকেই বেশি বেশি দুনিয়ার নিন্দা করি। আবার প্রত্যেকেই দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসার কারণে ফিতনায় জর্জরিত। হে অঢেল ধন-ভান্ডার ও প্রাচুর্যের অধিকারী! নিশ্চয়ই যতটুকু ধন-সম্পদ তোমার জন্য যথেষ্ট তার চেয়ে অতিরিক্ত যা কিছু তুমি সঞ্চয় করেছো তা নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ। অবশ্যই মৃত্যু তোমাকে পাকড়াও করবে, যদিও তুমি ওই সুউচ্চ, সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করো। আর যাদের অঢেল ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য রয়েছে, তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে, যেন তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। আর তোমার বন্ধকি ধন-সম্পদও বাজেয়াপ্ত হবে। কোথায় আমাদের পূর্ব পুরুষগণ, আর কোথায় তাদের পূর্ব পুরুষেরা! কোথায় আমাদের প্রজন্ম, আর কোথায় তাদের প্রজন্ম! কত লোকই তো পৃথিবীতে ছিল, কিন্তু কালের বিবর্তন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অবশেষে তারা এমনভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছে যেন তারা ছিলই না। নিশ্চয়ই এমন সিদ্ধান্ত যা আল্লাহ পাকের আনুগত্যের দিকে উদ্বুদ্ধ করে তা অত্যন্ত বরকতময় ও ত্যাগী সিদ্ধান্ত।
(শারহুস সুদুর, ইমাম সুয়ুতি: ১২০। আহওয়ালুল কুবুর: ৫৮)

উপদেশ ৪:

বিশর বিন মানসুর সালিমী বলেন, আতা আযরাক আমাকে বলেন, "তুমি যখন কবরস্থানে যাবে, তখন তোমার মনের অবস্থা যেন এমন হয় যে, তুমি কবরের মধ্যে রয়েছ। এক রাতে আমি এক কবরস্থানে গিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নিজেকে কবরবাসীদের একজন ভাবছিলাম। এমন সময় একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম,

হে উদাসীন নিদ্রাকাতর, এখানে তুমি পরিপূর্ণ নিয়ামত কিংবা অপমানজনক ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির যেকোনো একটির সম্মুখীন হতে চলেছ।"

(শরহুস সুদূর, ২১৪)

উপদেশ ৫:

আবু হুরায়রা বলেন, দুটি নতুন কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূল (সা:) বলেন,

لَرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَيْرٌ مِمَّا يَحْفِرُونَ أَوْ يَنْقِلُونَ

“কবরবাসীর নিকট নিজেদের সঞ্চিত বা অর্জিত সমুদয় বস্তু অপেক্ষা দুই রাকাত নফল নামাযের মূল্য অনেক বেশি।”

বর্ণনাকারী আবু হিশাম সন্দেহ পোষণ করে বলেন, “সম্ভবত তারা নিজেদের পার্থিব অনেক নিয়ামতের তুলনায় আমলনামায় এমন দুই রাকাত সালাতের সওয়াব দেখতে বেশি পছন্দ করবেন।”
(মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবাহ, ২/১৫৮। হাদিস নং ৭৬৩৩)

উপদেশ ৬:

আবদুল্লাহ বিন উমর বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,

القَبْرُ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ جَهَنَّمَ أَوْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ

“কবর জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত অথবা জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।”
(তিরমিজি, হাদীস নং ২৪৬০)

উপদেশ ৭:

উমর ইবনু আবদুল আযীয (র.)-এর সতর্কবাণী: তিনি বলতেন,

"হে লোকসকল! তোমরা দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরে আছো, অথচ একদিন তোমরা কবরে প্রবেশ করবে। তোমাদের দুনিয়ার প্রাচুর্য ও চাকচিক্য সেখানে কোনো কাজে আসবে না। বরং সাদা কাপড়ে জড়িয়ে তোমাদের মাটির নিচে শুইয়ে দেওয়া হবে।”

জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ

জান্নাতের পরিচয়:

‘জান্নাত’ একটি আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ বাগান, উদ্যান, আবৃত স্থান। ফার্সি ভাষায় একে বলা হয় “বেহেস্ত”। ইসলামি পরিভাষায়, আখিরাতে ঈমানদার ও নেককার বান্দাদের জন্য যে চির-শান্তির আবাস্থল তৈরি করে রাখা হয়েছে, তাকে জান্নাত বলা হয়।

জান্নাত হলো চির-শান্তির স্থান। সেখানে সবকিছুই সুন্দর ও আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সু-সজ্জিত। জান্নাতের ঘর-বাড়ি, আসন, আসবাবপত্র সবকিছু স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তি দ্বারা নির্মিত। জান্নাতে থাকবে রেশমের গালিচা, দুধ ও মধুর নহর, মিষ্টি পানির স্রোতধারা। বস্তত আনন্দ উপভোগের সব-রকম জিনিসই জান্নাতে বিদ্যমান থাকবে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন-
"সেখানে (জান্নাত) তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই তোমাদের জন্য রয়েছে আর তোমরা যা দাবি করবে তাও তোমাদের দেওয়া হবে।"
(সুরা হামিম আসসাজদা, আয়াত: ৩১)

জান্নাতের প্রকারভেদ:

জান্নাত হলো আটটি। যথা-

১. জান্নাতুল ফিরদাউস
২. জান্নাতুল মাওয়া
৩. জান্নাতুল আদন
৪. জান্নাতুন নাঈম
৫. দারুস সালাম
৬. দারুল খুলদ
৭. দারুল মুকামাত
৮. দারুল ক্বারার

১. জান্নাতুল ফিরদাউস-

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خُلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا

অর্থ: অপরদিকে যারা আল্লাহ ওপর ঈমান এনেছে এবং সে অনুযায়ী নেক কাজ করেছে, তাদের মেহমানদারীর জন্যে 'জান্নাতুল ফেরদাউস' সাজানো রয়েছে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার জন্যে জায়গা বদল করতে চাইবে না। (সূরা কাহফ, আয়াত ১০৭-১০৮)

সামুরাহ (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতুল ফিরদাউস হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর, জান্নাতের মধ্যমনি এবং সর্বোৎকৃষ্ট।” (তাবারী- ১৮/১৩৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন তাঁর কাছে ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা কর। কেননা, ওটাই সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। ওখান হতেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হয়।”
(ফাতহুল বারী- ১৩/৪১৫)

সেটাই হবে তাদের অতিথিশালা। সেখানে তারা অতিথি হিসেবে চিরকাল অবস্থান করবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবে না এবং বের হওয়ার কামনাও তারা করবে না। কেননা, ওর চেয়ে সুখময় স্থান আর নেই। সেখানে সর্বপ্রকার উচ্চ মানের জীবনোপকরণের সুব্যবস্থা রয়েছে। কোনো কিছুরই অভাব নেই। একের পর এক রহমত আসতেই থাকবে।

আবু হুরায়রাহ (রা:) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছে, সালাত কায়েম করে ও রমাদানের সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তা'য়ালার উপর এ বান্দার হক রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে হিজরত করে থাকুক বা বাড়িতে বসেই থাকুক। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা অন্যদেরকেও এ হাদীস শুনিয়ে দিবো কি?'

তিনি উত্তরে বললেন, 'জান্নাতে একশ'টি শ্রেণী অর্থাৎ স্তর রয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য তৈরি করেছেন। প্রতি দু'শ্রেণীর মাঝে এতোটা দূরত্ব রয়েছে যতোটা দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মাঝে। সুতরাং, যখনই তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা করবে। ওটা সবচেয়ে উঁচু ও সর্বাপেক্ষা উত্তম জান্নাত। জান্নাতসমূহের সমস্ত নহর ওখান থেকেই উৎসারিত হয়। ওর উপরেই রাহমানের তথা আল্লাহর আরশ রয়েছে।'
(ফাতহুল বারী- ৬/১৪)

আবু হুরায়রাহ (রা:) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা আমার উপর দুরুদ পাঠ করবে তখন আল্লাহর কাছে আমার জন্য 'ওয়াসীলা' চাইবে।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! 'ওয়াসীলা' কি?' তিনি উত্তরে বললেন, 'ওটা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চতম শ্রেণী/স্তর, যা একটি মাত্র লোক লাভ করবে। আমি আশা রাখি যে, ঐ লোকটি আমিই।'
(আহমাদ- ২/২৫৬)

২. জান্নাতুল মাওয়া-
আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.

অর্থ: আর যে তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় করে, আর নিজ আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখে। নিশ্চয়ই জান্নাতুল মাওয়া তার বাসস্থান।
(সূরা নাযিআত, আয়াত: ৪০-৪১)

ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার এই কঠিন পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে, তাদের জন্য চিরস্থায়ী ঠিকানা হিসেবে 'জান্নাতুল মাওয়া' বা আশ্রয়স্থল নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩. জান্নাতুল খুলদ-

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ مَصِيرًا

অর্থ: হে নবী! তুমি বলো, জাহান্নামের এ কঠোর আযাব উত্তম- না সেই জান্নাতুল খুলদের স্থায়ী জান্নাত যার ওয়াদা মুত্তাকীদের আগেই দিয়ে রাখা হয়েছে; এ জান্নাতই হচ্ছে তাদের যথাযথ পুরস্কার ও চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনের স্থান!"
(সূরা ফুরকান, আয়াত: ১৫)

কিছু লোককে অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় উল্টামুখে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। ঐ সময় তারা শৃঙ্খলিত থাকবে। তারা থাকবে অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থানে, যেখান থেকে না তারা ছুটতে পারবে, না নড়তে পারবে, আর না পালাতে পারবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর, এটাই কি উত্তম, নাকি স্থায়ী জান্নাত উত্তম, যার প্রতিশ্রুতি মুত্তাকীদেরকে দেওয়া হয়েছে?

৪. জান্নাতুন নাঈম-

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهُرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ
دَعُونَهُمْ فِيْهَا سُبْحْنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَاخِرُ دَعُونَهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

অর্থ: অপরদিকে যারা আল্লাহ তা'য়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের রব তাদের এ ঈমানের কারণেই তাদের সঠিক পথ দেখাবেন; জান্নাতুন নাঈম-এ তাদের তলদেশ দিয়ে অসংখ্য নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে সুপেয় ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। এ সময় সেখানে তাদের একটি মাত্র ধ্বনিই থাকবে, হে আল্লাহ, তুমি মহান, তুমি পবিত্র! সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম' এবং তাদের শেষ ডাক হবে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন অর্থাৎ, যাবতীয় প্রশংসা সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তাআলার জন্যে।"
(সূরা ইউনুস, আয়াত ৯-১০)

৫. জান্নাতুল আদন-

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জান্নাতের একটি প্রাসাদের নাম 'আদন'। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَا وَ مَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থ: এ ধরনের মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের আল্লাহ তা'য়ালা এমন এক সুরম্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, জান্নাতুল আদনে তাদের জন্যে সুন্দর সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকবে; সেদিনের সবচাইতে বড় নিয়ামত হবে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি; এটাই হবে সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।
(সূরা তাওবা, আয়াত: ৭২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"দু'টি জান্নাত শুধু সোনার তৈরি ও দু'টির পাত্র এবং ও দু'টির মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই সোনার তৈরি। আর দু'টি জান্নাত রয়েছে রূপার তৈরি ও দু'টির পাত্র এবং অন্য যা কিছু রয়েছে সবই রূপার তৈরি। ঐসব জান্নাতবাসীরা তাদের রবের দিকে এমন অবস্থায় তাকিয়ে থাকবে যে, তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যময় চাদর ছাড়া অন্য কোনো পর্দা থাকবে না। এটা আদন নামক জান্নাতের মধ্যে হবে।"
(ফাতহুল বারী ৮/৪৯১, মুসলিম ১/১৬৩)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি যা তাদের সমুদয় ভোগ্য বস্তু অপেক্ষা বড় ও মর্যাদাপূর্ণ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"মহামহিমান্বিত আল্লাহ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, 'হে জান্নাতবাসীরা!' তখন তারা সমস্বরে বলে উঠবে, 'হে আমাদের রব! আমরা আপনার দরবারে হাযির আছি। আপনার হাতেই রয়েছে কল্যাণ।' আল্লাহ তখন বলবেন, 'তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছো কি?' তারা উত্তরে বলবে, 'হে আমাদের রব! কেনো আমরা সন্তুষ্ট হবো না? আপনি তো আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টির মধ্যে আর কাউকে দান করেননি।' আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, 'এর চেয়ে উত্তম জিনিস কি আমি তোমাদেরকে দান করবো না?' তারা জবাব দিবে, 'হে আমাদের রব! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে?' আল্লাহ বলবেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে, জেনে রেখো যে, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করলাম। আজ থেকে আমি তোমাদের উপর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।"

(ফাতহুল বারী- ১১/৪২৩, মুসলিম-৪/২১৭৬)

৬. দারুস সালাম-

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ: তাদের মালিকের কাছে রয়েছে তাদের জন্যে দারুস সালাম (শান্তির এক সুন্দর নিবাস), আল্লাহ তাআলাই তাদের অভিভাবক, দুনিয়ায় তারা যা করতো এটা হচ্ছে তারই বিনিময়। (সূরা আনআম, আয়াত: ১২৭)

দুনিয়ায় শান্তির পথে চলার কারণে কিয়ামতের দিনও তারা লাভ করবে শান্তির ঘর যার অর্থ দারুস সালাম। স্বয়ং আল্লাহ তাদের রক্ষক, সাহায্যকারী শক্তিদানকারী। কেননা, তারা ভালো আমল করে থাকে। (ইবনে কাসীর-৮/১৮২)

৭. দারুল মুকামাত-

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ

অর্থ: তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আজ আমাদের কাছ থেকে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করে দিয়েছেন; অবশ্যই আমাদের রব ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী, যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের, দারুল মুকামাত এতো সুন্দর নিবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেখানে আমাদের আর কোনো রকম কষ্ট স্পর্শ করবে না, স্পর্শ করবে না আমাদের কোনো রকম ক্লান্তি ও অবসাদ!
(সূরা ফাতির, আয়াত: ৩৪-৩৫)

৮. দারুল ক্বারার-

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰقَوْمِ إِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

অর্থ: হে আমার জাতি! অবশ্যই তোমাদের এ জীবন মাত্র কয়েকদিনের উপভোগের বস্তু মাত্র। নিঃসন্দেহে আখিরাত হচ্ছে মুমিনদের দারুল ক্বারার তথা স্থায়ী নিবাস!
(সূরা মুমিন, আয়াত ৩৯)

এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতের শান্তি ও দুর্ভোগ হবে চিরস্থায়ী। কেউ মন্দ কর্ম করলে সে শুধু তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা ঈমান থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে অপরিমিত জীবনোপকরণ দেওয়া হবে।

জান্নাতের নেয়ামত সমূহ:

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ
لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

আমি আমার নেককার বান্দার জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি। কোন কান শোনেনি। কোন মানব হৃদয়ে যার ভাব উদয় হয়নি। যদি তোমরা চাও, তবে পাঠ কর- 'কেউই জানে না, তাদের জন্য চোখ জুড়ানো নয়নাভিরাম কী কী প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে। তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।'
(সূরা সাজদাহ: ১৭ এবং
সহীহ বুখারী: ৩২৪৪; সহীহ মুসলিম: ২৮২৪)

১. জান্নাতি নহর ও হাউজে কাউসার

দুনিয়ার খাঁটি মধু, খাঁটি দুধ সহজে পাওয়া যায় না। আর জান্নাতে আল্লাহ মুত্তাকীনদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন খাঁটি দুধের ঝর্ণাধারা এবং মধুর নহর। যার স্বাদ পরিবর্তিত হওয়ার নয়। পানকারীর জন্য তা হবে সুস্বাদু ও হৃদয় জুড়ানো। এই নহরগুলো থেকে পরে আরো নহরের শাখা-প্রশাখা বের হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাঃ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেছেন,

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج.

অর্থঃ "কাউসার জান্নাতের একটি ঝর্ণা। এর দুই প্রান্তে রয়েছে স্বর্ণ। এর পানি প্রবাহিত হয় মোতি ও ইয়াকুত পাথরের উপর। এর মাটি হলো মেশকের চাইতেও সুগন্ধযুক্ত। এর পানি হলো মধু অপেক্ষা মিষ্টি এবং দুধ অপেক্ষা সাদা।"

(তিরমিযী, ৩৩৬১)

২. জান্নাতিদের বৃক্ষরাজি, ফল-মূল, পানীয় এবং আরাম আয়েশ

স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে জান্নাতীরা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা পানপাত্র ও খাঁটি সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে। আর তাদের পছন্দমত ফল-মূল নিয়ে, রুচিমত পাখির মাংস নিয়ে তারা তথায় অবস্থান করবে এবং সেথায় থাকবে নয়ন জুড়ানো হুরগণ। তারা আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়। এগুলো পাবে জান্নাতীরা তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

তারা তথায় অবান্তর ও খারাপ কথা শুনবে না। কিন্তু শুনবে "সালাম" আর "সালাম"। যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান। তাদের জন্য রয়েছে কাঁটা বিহীন বড়ই বৃক্ষ, কাঁদি কাঁদি কলা, দীর্ঘ ছায়া এবং প্রবাহিত পানি ও প্রচুর ফল-মূল। যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়। আর থাকবে উচু শয্যা।

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا

“জান্নাতের এমন বৃক্ষ রয়েছে যে যার ছায়ায় কোনো অশ্বারোহী যদি কোন উন্নত দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে একশ বছর ভ্রমণ করে, তবুও তা অতিক্রম করতে পারবে না।”
(সহীহ মুসলিম: ২৮২৮)

৩. আল্লাহর দীদার

আল্লাহর দীদার বা মহান সৃষ্টিকর্তাকে সরাসরি দর্শন করা হলো একজন মুমিনের জীবনের চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ সাফল্য। আল্লাহ তা'য়ালাকে এই পার্থিব জীবনে চর্মচোখে দেখা সম্ভব না হলেও, পরকালে জান্নাতবাসীরা পরম সৌভাগ্য হিসেবে সরাসরি তাঁর দীদার লাভ করবেন।

আল্লাহর সাথে বান্দার দীদার ও সাক্ষাতের বিভিন্ন স্তর থাকবে। কেউ সপ্তাহে একবার তথা শুক্রবার এই সাক্ষাত লাভ করবে। কেউবা দৈনিক সকাল-বিকাল সাক্ষাত লাভ করবে। সেই

সাক্ষাতে আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, "আমি তোমাদের প্রতি খুশি, সন্তুষ্ট। তোমাদের উপর আমি রাজি হয়ে গেলাম।" এক সাক্ষাতে আট লক্ষ বছর পার হয়ে যাবে। জান্নাতিদের জন্য এটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كُنَّا عِنْدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ

"আমরা একবার পূর্ণিমার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা যেমন এই চাঁদকে স্পষ্ট দেখছো, তেমনি তোমরা আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখবে। তোমরা কোনরূপ ভিড়-ভাট্টা ছাড়াই সুস্থিরভাবে তাঁকে দেখতে পাবে।"
(সহীহ বুখারী: ৫৫৪)

৪. জান্নাতিদের শক্তি ও তাঁদের কোন মৃত্যু থাকবেনা

জান্নাতে মানুষের কোনো মৃত্যু থাকবে না; জান্নাতিরা সেখানে চিরকাল বেঁচে থাকবেন এবং তাঁদের শারীরিক শক্তি হবে অতুলনীয়। দুনিয়ার মতো সেখানে কোনো বার্ধক্য, দুর্বলতা, রোগ-শোক, অস্তিত্ব বা হারানোর কোনো ভয় থাকবে না। এছাড়া মুমিন বান্দারা জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাঁদের শারীরিক শক্তি ও ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

জান্নাতবাসীরা কেশ ও দাড়িবিহীন হবেন। তাদের চক্ষু সুরমায়িত হবে, যৌবন কখনোই ফুরাবে না এবং তাঁদের কাপড় চোপড়ও কখনো পুরাতন হবেনা। এছাড়া জান্নাতে মুমিনদেরকে এত পরিমাণ শক্তি প্রদান করা হবে যে, প্রত্যেকে ১০০ পুরুষের সমান শক্তিশালী হবে।

দুনিয়ার সকল মানুষ চারটি জিনিস কামনা করে যা দুনিয়ায় লাভ করা সম্ভব নয়। এগুলো হলো:

- চির জীবন।
- চির যৌবন।

- চির সুস্থতা।
- চির শান্তি।

মহানবি (সা:) ইরশাদ করেছেন, যখন জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতিগণ! এখন আর তোমরা কোন দিন অসুস্থ হয়ে পড়বে না। সর্বদা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান থাকবে। কোন দিন আর মৃত্যু হবে না, আজীবন জীবিত থাকবে। কখনও বুড়ো হবে না, সর্বদা যুবক থাকবে। সর্বদা নেয়ামত ভোগ করবে। কখনও দুঃখে থাকবে না। (মুসলিম, তিরমিযী)

৫. জান্নাতি হুর

হুর হলো জান্নাতের চিরযৌবনা, অতুলনীয় সুন্দরী ও পবিত্র নারী। পরকালে সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাদের বিশেষ উপহার বা সঙ্গী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এরা সাধারণ মানবীয় ত্রুটিমুক্ত এবং তাদের সৌন্দর্য ও গুণাবলি পার্থিব জগতের কল্পনারও অতীত।

হুররা হবে সুরক্ষিত কুমারী। হুর স্ত্রীদের গঠন ও সৌন্দর্য হবে অতুলনীয়। অধিক সৌন্দর্যের কারণে জান্নাতি নারী ও হুরদের দেহে স্বচ্ছতা থাকবে। ফলে তাদের শরীরের হাড়ের মগজও দেখা যাবে। তাদের আগে কোনো জ্বীন বা মানুষ স্পর্শ করেনি। জান্নাতি হুরদের কাজ হবে স্বামীর মনোরঞ্জন করা। তারা আর কোনো কাজে লিপ্ত হবে না।

জাহান্নামের পরিচয়:

কুরআনে বর্ণিত জাহান্নামের অপর নামগুলো হলো আগুন, জ্বলন্ত আগুন, চূর্ণবিচূর্ণকারী, অতল গহ্বর ইত্যাদি। এই নামগুলো প্রায়শই জাহান্নামের বিভিন্ন প্রবেশদ্বারের নাম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

জাহান্নাম (আরবি: جهنم) বা দোজখ ইসলামের পরিভাষায় পরকালের আবাসস্থল যা এমন পাপীদের জন্য নির্দিষ্ট যারা আল্লাহর ক্ষমা লাভ করবে না। এই ধারণাটি ইসলামি ধর্মতত্ত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং মুসলিম বিশ্বাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

জাহান্নামের প্রকারভেদ:

জাহান্নাম হলো সাতটি। যথা:

১. জাহান্নাম
২. জাহীম
৩. হাবিয়া
৪. হুতামাহ
৫. লাজা
৬. সাকার
৭. সায়ীর

১. জাহান্নাম-

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

অর্থ: যখন তাকে বলা হয় ফিতনা-ফাসাদ না করে তুমি আল্লাহকে ভয় করো, তখন মিথ্যা অহংকার তাকে গুনাহর প্রতি আরো বেশি উৎসাহিত করে, মূলতঃ এ চরিত্রের লোকের জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট; অবশ্যই জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা!
(সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৬)

কুরআন মাজীদে মোট একাশিটি স্থানে জাহান্নাম শব্দটি এসেছে।

২. জাহীম-

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغٰوِيْنَ

অর্থ: এবং জাহীমকে গুনাহগারদের জন্যে উন্মোচন করে দেওয়া হবে।
(সূরা শুআরা, আয়াত: ৯১)

এ নামটি কুরআন কারীমে ছাব্বিশ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. হাবিয়া-

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

অর্থ: দোযখই হবে তার ঠিকানা।
(সূরা ক্বারিয়াহ, আয়াত: ৯)

কুরআন মাজিদে এ নামটি শুধু এখানেই এসেছে।

হাবিয়া জাহান্নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, "সেটা কি তা তোমার জানা আছে? সেটা এক জ্বলন্ত অগ্নি"।

৪. হুতামাহ-

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَ مَا أَدْرُكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ لي الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّسَدَّدَةٍ ا

অর্থ: না! কখনো নয়, অল্পদিনের মধ্যেই সে নির্ঘাত চূর্ণ-বিচূর্ণকারী আগুন হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে, তুমি কি জানো, এই চূর্ণ বিচূর্ণকারী আগুন কেমন? এ হচ্ছে সম্পদ লোভীদের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালার প্রজ্জ্বলিত এক আগুন, যা এর দহন যন্ত্রণাসহ মানুষের হৃদয়ের গভীরে পর্যন্ত পৌছে যাবে; অগ্নিকুণ্ডলীর গর্ত বন্ধ করে তাদের ওপর ঢাকনা দিয়ে রাখা হবে, তা গেড়ে রাখা হবে উঁচু উঁচু থামের মধ্যে।
(সূরা হুমাযা, আয়াত: ৪-৯)

এ নামটি উপরিউক্ত দু'টি আয়াত ব্যতীত কুরআনের অন্যত্র পাওয়া যায় না।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (র) বলেন, "প্রজ্জ্বলিত আগুন বুকের ভিতরকার সবকিছু ছেয়ে ফেলে এবং কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌছে যায়, তারপর ফিরে আসে, আবার সেখানে পৌছে।"
(কুরতুবী ২০/১৮৫)

৫. **লাযা-**

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

كَلَّا إِنَّهَا لَظَى

অর্থ: না কিছুতেই সেদিন বাঁচা যাবে না; জাহান্নাম হচ্ছে একটি প্রজ্জ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা লাযা।
(সূরা মাআরিজ, আয়াত: ১৫)

কুরআনে এটি মাত্র একবার উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. **সাকার-**

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

سَأُصْلِيْهِ سَقَى

অর্থ: অচিরেই আমি তাকে সাকার-এ প্রবেশ করাবো।
(সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত: ২৬)

আল কুরআনের দু'টি সূরায় মোট চারটি আয়াতে এ নামটি উদ্ধৃত হয়েছে।

৭. সায়ীর-

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

অর্থ: যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তা'য়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো, তখন তারা বলে, আমরা কেবল সে বস্তুরই অনুসরণ করবো, যার ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি; কিন্তু শয়তান যদি তাদের বাপ-দাদাদের জাহান্নামের সায়ীরের আযাবের দিকে ডাকতে থাকে তাহলেও কি এরা তাদের অনুসরণ করবে?
(সূরা লোকমান, আয়াত: ২১)

দোযখের এ নামটি কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে আঠারো বার এসেছে।

জাহান্নামের ভয়াবহতা:

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِن كَانَتْ لَكَافِيَةٌ، قَالَ: فَضُلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا

"তোমাদের আগুন (তোমরা যে আগুন দেখ) জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। তখন বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, দুনিয়ার আগুনই তো পাপীর জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, এ আগুনকে আরও নিরানব্বই গুণ বৃদ্ধি করা হবে, প্রত্যেক অংশের উত্তাপই সমান হবে।"
(সহীহ বুখারী: ৩২৬৫)

১. জাহান্নামের সাপ ও বিচ্ছু

জাহান্নামে এমন সব সাপ রয়েছে, যেগুলো হবে খোরাসানী উটের ঘাড়ের ন্যায়। এগুলোর একেকটি দংশন করলে সত্তর বছর পর্যন্ত এর ব্যথা অনুভব হবে আর জাহান্নামে এমন সব বিচ্ছু রয়েছে, যেগুলো গাধার ন্যায় বড়। এগুলোর একটি দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এর ব্যথা অনুভব হবে।

জাহান্নামের সাপ হবে অত্যন্ত বিষাক্ত ও টাকমাথাবিশিষ্ট। তার দু'চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে।
আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, "আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সেই সম্পদকে টাকমাথা বিষাক্ত সাপে রূপান্তরিত করা হবে। যার দু'চোখে দু'টি কালো বিন্দু থাকবে। কিয়ামতের দিন ঐ সাপ তার গলা পেঁচিয়ে ধরবে এবং তার দু'চোয়াল কামড়ে ধরে বলতে থাকবে, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। আমি তোমার সঞ্চিত ধন।"
(সহীহ বুখারী, হা/১৪০৩; মিশকাত হা/১৭৭৪)

২. জাহান্নামের গভীরতা

জাহান্নামের গভীরতা অসীম এবং মানবীয় হিসাবের ঊর্ধ্বে। তবে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা এই সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় যে, জাহান্নামের গভীরতা এতই বিশাল যে এটি একটি পাথর নিক্ষেপ করলে তা তার তলদেশে গিয়ে পৌঁছাতে ৭০ বছর সময় লাগে। এর প্রশস্ততা আকাশ

ও জমিনের দূরত্বের চেয়েও অধিক। জাহান্নামের সীমানার দুটি দেয়ালের মাঝে ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব।

৩. ভয়ংকর সেতু পুলসিরাত

পুলসিরাত হলো শেষ বিচারের দিনে তথা হাশরের ময়দান জাহান্নামের ওপর দিয়ে জান্নাত পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অত্যন্ত ভয়ংকর ও দুর্লঙ্ঘনীয় সেতু।
এই পুলসিরাত থাকবে জাহান্নামের উপর দিয়ে। চুলের চেয়েও চিকন হবে ও খুড়ের চেয়েও ধারালো হবে। সবাইকে পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে। সেদিন কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউবা ঘোড়ার গতিতে, কেউ দৌঁড়িয়ে, কেউ হেঁটে আবার কেউ হামাগুরি দিয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করবে। তবে যারা নামাজি, তারা বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত পার করবে।

আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا • ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.

অর্থ: তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তার উপর আরোহণ করবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা। অতঃপর আমি পরহেজগারদের উদ্ধার করবো এবং জালিমদের নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।
(সূরা মারিয়াম, আয়াত ৭১,৭২)

৪. জাহান্নাম যা দিয়ে ঢাকা

বলা হয়ে থাকে, জান্নাত দুঃখ, কষ্ট, শ্রমসাধ্য এই বিষয়গুলো দ্বারা পরিবেষ্টিত আর অন্যদিকে জাহান্নাম কু-প্রবৃত্তি ও লালসা দ্বারা পরিবেষ্টিত।
সুতরাং দুনিয়ায় যারা দুঃখ, কষ্ট, দৈন্য-দুর্দশা সহ্য করে আল্লাহর বিধিবিধান মান্য করে চলবে তারা হবে জান্নাতি। আর যারা কু-প্রবৃত্তি ও দুনিয়ার লালসায় গা ভাসিয়ে দিবে তারা হবে জাহান্নামি।

৫. জাহান্নামের সবচেয়ে সহজ আযাব

জাহান্নামে সবচেয়ে সহজ শাস্তি হবে আগুনের জুতা। যা মুহাম্মদ (সা:) এর চাচা আবু তালিবকে দেওয়া হবে। কেননা তিনি ছিলেন মক্কার কাফেরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নবী (সা:) এর ঢালস্বরূপ। তিনি মৃত্যুর আগ অব্দি নবী (সা:) কে নিজ স্নেহে আগলে রেখেছেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করে অমুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করায় তাকে জাহান্নামের সবচেয়ে লঘু শাস্তি দেওয়া হবে।

রাসূল সা: বলেছেন,

إِنْ أَعْونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَرَجُلٌ لوضع في الحمص قدميه را بغل منها وقالهُ مَا بَرَى، أَنْ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا

"নিশ্চয় কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সহজ ও নিম্নমানের আযাব হবে এমন ব্যক্তির, যার দুই পায়ে আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে। যার কারণে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। আর সে মনে করবে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কাউকে দেওয়া হয়নি। অথচ সেটাই হলো সবচেয়ে লঘু শাস্তি।"
(সহীহ বুখারী: ৬৫৬১)

৬. দোযখের নিঃশ্বাস ও তার প্রহরী সংখ্যা

দোযখ তার প্রভু রব্বুল আলামীনের কাছে অনুযোগ করে বলে, হে আমার রব! আমার কতক অংশ অন্য অংশকে গ্রাস করে নিচ্ছে। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য দুটো শ্বাসের ব্যবস্থা করে দেন। একটি শ্বাস শীতে ও আরেকটি গ্রীষ্মে।
অতএব তোমরা যে কঠোর শৈত- প্রবাহ পেয়ে থাকো তা হলো জাহান্নামের শৈত-প্রবাহ। আর তোমরা যে প্রচন্ড গরম পেয়ে থাকো তা হলো জাহান্নামের উত্তাপ।
(বুখারী, ৩২৬০)

আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদেরকেই জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন। আর কাফিরদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। জাহান্নামের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে ১৯ জন্য প্রহরী। সংখ্যা নির্ধারণের কারন হলো যাতে কিতাবপ্রাপ্তরা ও মুমিনরা সন্দেহ পোষণ না করেন।

মৃত্যুহীন পরকালীন জীবন

মৃত্যুহীন পরকালীন জীবন হলো ইহকালের কর্মফলের চিরস্থায়ী আবাস, যা 'আখিরাত' নামে পরিচিত। এটি মানুষের রুহের জগত ও পার্থিব জীবনের পরের অনন্ত ধাপ।

যে মানুষ মৃত্যুর সাথে কখনো আলিঙ্গন করতে চায় না, যে মানুষ কবিতার ছন্দে গান গায়, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে", যে মানুষ মৃত্যুর ভয়ে সদা পালিয়ে বেড়ায়, সে মানুষ জাহান্নামে নিজের মৃত্যুর জন্য আবেদন, চিৎকার, অনুনয়-বিনয় করবে শুধু জাহান্নামের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের জন্য; কিন্তু কখনো সে আবেদন পূরণ হবে না, মৃত্যু হবে না।
এ বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

অর্থ: প্রথম মৃত্যু ছাড়া যা দুনিয়াতেই এসে গেছে, সেখানে তাদের আর মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে না, তাদের রব মুত্তাকীদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন। (সূরা দুখান, আয়াত: ৫৬)

দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার সময় যে মৃত্যুবরণ করেছে এটাই একমাত্র মৃত্যু। এরপর বেহেশত ও দোযখবাসীর কারোরই আর কোনো মৃত্যু নেই।

আবূ সাঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেছেন,

জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাওয়ার পর মৃত্যুকে হাশরের মাঠে একটি সাদা-কালো ছাগলের সুরুতে নিয়ে আসা হবে। তারপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবেন, "হে জান্নাতবাসী!' তখন তারা ঘাড় উঁচু করবে এবং তাকাবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা কি এটাকে চিনো?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, এটা হলো, মৃত্যু।' তাদের প্রত্যেকেই তা দেখেছে। তারপর আহ্বানকারী আবার আহ্বান করে ডাকবেন, 'হে জাহান্নামবাসী!' তখন তারা ঘাড় উঁচু করে তাকাবে। তখন তাদের বলা হবে, 'তোমরা কি এটাকে চিনো?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আর তারা প্রত্যেক তা দেখেছে।' তারপর সেটাকে জবেহ করা হবে। তারপর বলবেন, 'হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে তোমরা এখানে থাক। এখানে কোনো মৃত্যু নেই।'

তারপর রাসূল (সা:) এ আয়াত পাঠ করলেন,

وَانْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থ: হে নবী! সেই আক্ষেপের দিনটি সম্পর্কে তুমি এদের সাবধান করে দাও, যেদিন জান্নাত জাহান্নামের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এখন তো এরা এ ব্যাপারে গাফলতিতে ডুবে রয়েছে, ওরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনছে না।
(সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩৯)

জান্নাতবাসীরা জান্নাতে যেমন কোনো দিন মরবে না, তেমনি জাহান্নামবাসীদেরও জাহান্নামে তাদের কোনো মৃত্যু আসবে না। মৃত্যুর জন্য যতো চিৎকারই তারা করুক না কেনো।
আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ

অর্থ: অপরদিকে যারা আল্লাহ তা'য়ালাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদের ওপর এমন আদেশ হবে না যে, তারা মরে যাবে- না তাদের থেকে জাহান্নামের আযাব লঘু করা হবে; আমি প্রতিটি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এভাবেই শাস্তি দেই।
(সূরা ফাতির, আয়াত: ৩৬)

জাহান্নামের ভীষণ শাস্তির তুলনায় মৃত্যুকে তারা শান্তির কারণ মনে করবে। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত যে, পরকালে আর কোনো মৃত্যু নেই। অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নাম উভয় স্থানেই মানুষের আর কোনো মৃত্যু নেই।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَ لَا يَحْيِي

অর্থ: যে ব্যক্তি কোনো অপরাধে অপরাধী হয়ে তার রবের কাছে হাজির হবে, অবশ্যই তার জন্যে রয়েছে জাহান্নাম, আর জাহান্নাম এমন এক জায়গা; যেখানে মানুষ মরতে চাইলেও মরবে না, আবার বাঁচার মতো করে বাঁচবেও না!"

(সূরা ত্বহা, আয়াত: ৭৪)

এছাড়া পবিত্র কুরআনে সূরা আ'লার **১১-১৩** নং আয়াতে বলা হয়েছে যে,

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا

অর্থ: আর যে পাপী ব্যক্তি সে তা এড়িয়ে যাবে, যে ব্যক্তি অচিরেই বিশালকায় এক আগুনে গিয়ে পড়বে, অতঃপর সেখানে সে মরবে না, বাঁচার মতো করে সে বাঁচবেও না।

দুনিয়ায় কোনো ঘরবাড়িতে আগুন লাগলে ভিতরের লোকেরা নিমিষেই মরে যায়। কিন্তু আখিরাতের আগুন, সেখানে শুধু জ্বলবেই জ্বলবে। মৃত্যুবরণ করবে না। কি ভয়াবহ অবস্থা!

পরকালীন প্রস্তুতি

কবরের শাস্তি থেকে বাঁচার উপায়

এক মুহূর্তের জন্য একটু ভাবুন, কবরের নির্জন, অন্ধকার ও একাকিত্ব, ফেরেশতাদের হাতে লোহার হাতুড়ি, জীবনে প্রথম বারের মতো সামনা-সামনি অকৃতকার্য হওয়ার ক্ষেত্রে শাস্তির ভয়- ছাড়ানোর কোনো লোক নেই; কোনো পথ-প্রদর্শকও নেই। অধিকাংশ মানুষের তো অবস্থা এই যে, যদি রাতের বেলায় হঠাৎ করে কোনো লোক এসে ঘরের দরজায় আঘাত করে, তা হলে ভয়ে প্রাণ যায় যায় অবস্থা হয়ে যায়। পুলিশের সামান্য একজন কর্মকর্তাকে আসতে দেখলে ঘাম ছুটে যায়। বন্ধ কামরায় বসে থাকা অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকারের মধ্যে কয়েক মিনিট বসে থাকতে মানুষ ভীতি অনুভব করে। অথচ সেই কবর হবে এর চেয়েও ভীতিকর।

- কবরের পরীক্ষায় পাস করার জন্য সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় শর্ত হল আকিদায়ে তাওহীদ তথা একত্ববাদের বিশ্বাস। এজন্য প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য নিজের আকিদাকে যেকোনো ধরণের শিরক থেকে পবিত্র করা এবং শিরকমুক্ত আকিদার উপর নিজের আমল-আখলাকের বুনিয়াদ স্থাপন করা।

আকিদায়ে তাওহীদের উপর আমল করার পরও কবরের পরীক্ষায় সুদৃঢ় থাকার তাওফীক আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে লাভ হবে। এরজন্য রবের দরবারে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইতে হবে।

- মৃত্যুর পরে কাফের ও মুশরিকের উপর প্রথম যেই অভিযোগ আরোপ করা হবে, তা হচ্ছে, তোমরা কুরআন মাজীদ পড়ার এবং জানার চেষ্টা করোনি কেন?

কবরের পরীক্ষায় শুধু তারাই পাস করবে, যারা কুরআন মাজীদের উপর ঈমান আনবে; কুরআন পড়বে এবং তার উপর আমল করবে। কুরআন মাজীদই সেই কিতাব, যা মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন তিনটির সঠিক উত্তর প্রস্তুত করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এক হাদীসে আছে, রাসূল (সা:) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইরশাদ করলেন, "এই দুই কবরে আযাব হচ্ছে। বড় কোন অপরাধের কারণে আযাব হচ্ছে না। একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করতো না। অপরজন চোগলখোরী করত।" পেশাব থেকে পবিত্রতা

অর্জন না করা কবীরা গুনাহ। ইবনে হাজার মক্কী রহঃ বলেন, ‘বেশীরভাগ কবরের আযাব পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন না করার কারণে হয়ে থাকে।’

এছাড়া সেই সকল কারণ থেকে বিরত থাকতে হবে, যা কবরের শাস্তি বয়ে আনে। কবরের শাস্তি থেকে বাঁচার আরেকটি উপায় হলো, ঘুমের পূর্বে এক ঘন্টা সময় আল্লাহর জন্য ব্যয় করা, তাতে পুরো দিনের লাভ লোকসানের হিসাব সম্পর্কে নিজেকে জিজ্ঞাসা করা। অতঃপর এর জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করে ঘুমানো এবং দৃঢ় সংকল্প করা যেন ঘুম থেকে জেগে পুনরায় অপরাধে লিপ্ত না হয়। এভাবে প্রত্যেক রাত্রিতে করা, অতঃপর সে যদি ঐ রাত্রিতে মারা যায় তাহলে সে তাওবার ওপর মারা যাবে। আর যদি ঘুম থেকে জেগে যায়, তবে সময় বেশি পাওয়ায় আনন্দ চিত্তে রবের শুকরিয়া আদায় করে আগের করা গুনাহ বা অপরাধের কাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে।

আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণে মগ্ন থাকা

আল্লাহ তা'য়ালার অধিক ইবাদত মুমিনকে শক্তিশালী করে তোলে। তার মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। তাকে সিক্ত করে স্থিরতা ও আত্মিক প্রশান্তির স্রোতধারায়। ইবাদতের মাধ্যমে যদি না হয়, তবে আর কীসের মাধ্যমে হবে পরকালের প্রস্তুতি!

একজন মুসলিম সারাটা দিনই মানুষের ভিড়ে হারিয়ে থাকবে, মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনায় সময় কাটিয়ে দেবে- এমনটা একেবারেই অনুচিত। এমন যদি অবস্থা হয়, তবে কখন সে মানুষটি নিজেকে সময় দেবে? কখন সে নিজের সংশোধনে, আত্মা পবিত্রকরণে সময় ব্যয় করবে? তাই পরকালের প্রস্তুতি-পরিকল্পনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে- দৈনিক কিছু সময় একাকী নির্জনে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত করা। রবের স্মরণে একান্ত আলাপনে সময় কাটানো। রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। এক মনে এক ধ্যানে নিজের মুহাসাবা তথা হিসাব-নিকাশ করা। দুটি নেয়ামতের বিষয়ে সতর্ক থাকা। তা যথাযথ কাজে লাগানো। নেয়ামত দুটি হলো, সুস্থতা ও অবসর।

মানুষের ভিড় থেকে নিজেকে মুক্ত করে একাকী নির্জনে প্রভুর সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটানোর জন্য একটা সময় নির্ধারণ করা উচিত। এ সময়টা কেবল প্রভুর ও আপনার হবে। অন্য কারও তাতে হস্তেক্ষেপের অধিকার থাকবে না। দৈনিক অন্তত দিনে একটি ঘণ্টা এবং রাতে একটি ঘণ্টা নির্ধারণ করা।

দিনের শুরুটা যেন আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে হয়। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে প্রথমে ঘুমের দুআ পড়া-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُور

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেওয়ার পর আবার জীবিত করেছেন। এবং আমরা তাঁরই নিকট পুনরুত্থিত হবো।"

এরপর ওযু করে সময়মতো মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা। এর ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে মুমিন দুই শীতলতার সময়কার নামাজ (ফজর ও আসর) আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"
(সহীহ বুখারী: ৫৭৪; সহীহ মুসলিম: ৬৩৫)

উসমান ইবনে আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন-

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

"যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতে আদায় করল, যেন সে অর্ধরাত নামাজে কাটাল। আর যে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করল, সে যেন পূর্ণ রাত নামাজ পড়ল।"
(সহীহ মুসলিম: ৬৫৬)

প্রতিদিন বিরাট প্রতিদান অর্জনে অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে না থেকে; বরং এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া। হাদীসে অনেক যিকিরের উল্লেখ আছে। রয়েছে এগুলোর স্বতন্ত্র প্রতিদান। এ সকল যিকির আদায় করে নিজেকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। উত্তম প্রতিদান ও ফলাফলের অধিকারী হওয়া। এখানে সহজ কিছু যিকির তুলে ধরা হয়েছে।

- প্রতিদিন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ১০০ বার পাঠ করলে মাস শেষে আমলনামায় জমা হবে তিন হাজার জান্নাতি ধনভাণ্ডার। আর যতই পাঠ করা হবে পরিমাণ বাড়াবে, ততই ধনভাণ্ডার বাড়তে থাকবে।

আবু মূসা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন-

أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ

"আমি কী তোমাকে জান্নাতের ধনভান্ডারসমূহ থেকে একটি ধনভান্ডার লাভের পদ্ধতি বলে দেবো না?" আমি বললাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি ইরশাদ করলেন, তা হলো لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ পাঠ করা।

(সহীহ বুখারী: ৪২০৫ ও সহীহ মুসলিম: ২৭০৪)

- যদি দিনে ১০০ বার سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهُ الْعَظِيمِ পড়া হয়, তবে মাস শেষে আমলনামায় ৬০০০ জান্নাতি গাছ জমা হবে।

জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

“যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে।"

(সুনানে তিরমিযী: ৩৪৬৪)

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

"দুটি কালিমা এমন যা উচ্চারণে হালকা, তবে ওজনে বেশ ভারী এবং দয়াময় আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। সে দুটি কালিমা হলো-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهُ الْعَظِيمِ

(সহীহ বুখারী: ৬৬৮২)

যদি কেউ প্রভুর প্রিয় হতে চায়, যদি চায় আখিরাতে পুণ্যের পাল্লা ভারী হোক। তবে, সে যেন বেশি বেশি এ কালিমাগুলো পাঠ করে।

- দৈনিক ১০০ বার اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ পাঠ করা। হাদীস শরীফে এর অনেক বড় ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةٌ

"যে ব্যক্তি মুমিন নর-নারীদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর সংখ্যার সমানুপাতে তার জন্য নেকি লিখে দেন।"
(মুসনাদে শামিয়ীন- তাবারানী: ৩/২৩৪)

এবার এ নেকিকে দশ দিয়ে গুণ করলে দেখা যাবে, একবার দুআ করার মাধ্যমে আদম আ. থেকে শুরু করে এ সময় পর্যন্ত কত মৃত-জীবিত মানুষের জন্য দুআ করা হয়ে গিয়েছে। আর আমলকারীর জন্য লিখিত নেকের পরিমাণ সংখ্যায় কত অধিক।

আল্লাহু আকবার। সে সৌভাগ্যবান কে? যিনি এ মহান কল্যাণের অধিকারী হবেন মাত্র কয়েক মুহূর্তের মাঝেই।

এ দুআটি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর দৈনন্দিন অযীফার অংশ ছিল। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলতেন, ইবনে তাইমিয়া এ দুআর প্রতি অন্যদেরকে উৎসাহিত করতেন।

সুতরাং, এ দুআ করার ক্ষেত্রে আগ্রহী ব্যক্তি সিজদায় হোক বা নামাজের বাইরে, সর্বদা এ দুআ পাঠ করা যাবে।

- প্রতিদিন ১০০ বার নিচের দু'আ পাঠ করা-

لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার এই দু'আ পাঠ করবে, ১০ জন গোলাম স্বাধীন করার সমপরিমাণ সাওয়াব তার আমলনামায় যুক্ত হবে, তার আমলনামায় ১০০ নেকি লেখা হবে, তার ১০০ পাপ মোচন করে দেওয়া হবে। সেদিনের সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এটি তাকে শয়তান থেকে সংরক্ষণ করবে। যে ব্যক্তি এই আমলটি সবচেয়ে বেশি করেছে, সে ব্যতীত আর কোনো ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক ফযীলতসম্পন্ন আমলের অধিকারী হবে না।"
(সহীহ বুখারী: ৩২৯৩)

- দৈনিক ১০০ বার سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ পাঠ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"যে ব্যক্তি দিনে ১০০ বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ পাঠ করবে, তার গুনাহগুলো মুছে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনা পরিমাণই হোক না কেন।"
(সহীহ বুখারী: ৬৪০৫; সহীহ মুসলিম: ২৬৯১)

- দৈনিক ১০০ বার أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ পাঠ করা।

আগার ইবনে ইয়াসার আল-মুযনী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-
"হে মানুষ সকল, তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো, তাঁর নিকট ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করো, কেননা আমি দিনে ১০০ বার তাওবা করি।"
(সহীহ মুসলিম: ২৭০২)

- দৈনিক ১০০ বার পড়া-

سُبْحَانَ اللّٰهِ

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন-

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: وَكَيْفَ يَكْسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ

"তোমাদের কোনো ব্যক্তি দৈনিক এক হাজার নেকি অর্জন করতে অপারগ হবে কি?" তাঁর সাথে উপবেশনকারীদের একজন জিজ্ঞেস করল, কীভাবে এক হাজার নেকি অর্জন করা যাবে? তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি ১০০ বার তাসবীহ তথা سُبْحَانَ اللّٰهِ পড়বে, তার জন্য এক হাজার নেকি লেখা হবে অথবা এক হাজার পাপ মোচন করা হবে।"
(সহীহ মুসলিম: ২৬৯৮)

আল্লাহর যিকির বা স্মরণ হলো অন্তরের প্রশান্তি, ঈমানের দৃঢ়তা ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রধান মাধ্যম। এই যিকির গুলো করতে বেশি সময় লাগবে না। অথচ এগুলোর একেকটা অনেক ফযিলতপূর্ণ। এর মাধ্যমে বান্দা ও স্রষ্টার মাঝে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। বেশি বেশি জিকির মানুষকে সব ধরনের গুনাহ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং পরকালে মুক্তি লাভের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। তাই মুমিনের উচিত যিকিরকে দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হিসেবে গড়ে তোলা।

কীভাবে অগ্রসর হতে হবে জান্নাতের দিকে?

জান্নাতের দিকে অগ্রসর হওয়ার উপায় হলো একনিষ্ঠ ঈমান, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অনুসরণ এবং সৎকর্মের মাধ্যমে নিজেকে মুত্তাকি তথা আল্লাহভীরু হিসেবে গড়ে তোলা।

তাই নেক আমলের বেলায় দেরি করা মোটেও উচিত নয়। বরং যখনই কোনো নেক আমল করার সুযোগ আসবে, সাথে সাথে তা করে ফেলাই উত্তম। নতুবা শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা নফস সেটি ভুলিয়ে দিতে পারে। ফলে উক্ত নেক আমল থেকে বান্দা বঞ্চিত হয়ে যেতে পারে। কেননা একটি ছোট্ট আমল অথচ তা করা হয়েছে খালেস নিয়তে, রিয়ামুক্ত ভাবে তবে তা হিসাব-নিকাশের দিন হতে পারে বড় কোনো মুক্তির উপায়। হতে পারে জান্নাত লাভের উপায়। সাহাবায়ে কেরামগণ নেক কাজে বা জান্নাত লাভের পথে ছিলেন সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী । যখনই কোন নেক আমল বা জান্নাত লাভের উপায় জানতে পারতেন তখনই তা সাথে সাথে করে ফেলার চেষ্টায় রত হতেন।

জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

“উহুদের দিন এক সাহাবী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যদি এখন নিহত হই, তাহলে আমি কোথায় থাকব বলে আপনি মনে করেন?' তিনি বললেন, 'জান্নাতে।' অতঃপর তিনি হাতে থাকা খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে লড়াই শুরু করলেন এবং এক পর্যায়ে শাহাদাত বরণ করেন।”
(সহীহ বুখারী: ৪০৪৬)

সুতরাং জান্নাত লাভ করতে একাগ্র চিত্তে দৌঁড়াতে হবে একমাত্র রবের দিক, তাঁর সন্তুষ্টির দিকে, তাঁর অপার ক্ষমার দিকে। তবেই জান্নাত লাভের মাধ্যমে সফলকাম হওয়া যাবে।
আল্লাহর দিকে দৌঁড়াতে হবে তিনটি কারনে:
১. আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য।
২. যে কোন সময় মৃত্যু এসে যেতে পারে, নেক আমল করার সময় না পাওয়ার আশঙ্কায়।
৩. প্রবল আকর্ষণ ও আগ্রহের জন্য।

কিন্তু দূর্ভাগ্য হলো, আমরা অধিকাংশই দৌঁড়াচ্ছি পৃথিবীর জন্য! ভোগ বিলাস বাড়ী গাড়ী সম্পদের জন্য! শিক্ষার নামে সনদের জন্য- যার কাগজের মূল্য নেই ঐ পারে।
কিন্তু এসব না ভেবে কু-যুক্তি দিয়ে যারা ভোগ আর পূজির দাস বানাচ্ছে, তারাও জানে মৃত্যুর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই!
তাই তাকে ভোলাতেই ভোগের যত চাকচিক্য আয়োজন! পূজির যত লোভনীয় সব অফার! মানুষও ছুটছে তার পিছু- যতক্ষণ না মৃত্যুর ফেরেশতা এসে হাজির হচ্ছে!
অথচ মৃত্যুর পর এসব কাগজ, কানাকড়ি কোন কাজে আসবেনা। তা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে কোন উপকারেই আসবেনা। মৃত্যুর পর জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে উপকারে আসবে দুনিয়াতে করে যাওয়া নেক আমল, নেককার সন্তান, সাদকায়ে জারিয়াহ। এগুলোই জান্নাতের দিকে অগ্রসর হওয়ার একমাত্র পথ-পন্থা।

জান্নাত লাভের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা। তাই নিজের সৎকাজের পাশাপাশি সর্বদা আল্লাহর দয়া ও করুণার ওপর নির্ভর করতে হবে।

দুনিয়া বিমুখতা ও ঈমানী পরিবেশে অবস্থান

ইসলামে 'দুনিয়া বিমুখতা' বা 'যুহুদ' হলো পার্থিব জীবনের মোহ ও ভালোবাসাকে অন্তর থেকে দূর করা। এর অর্থ সংসার ত্যাগ করা বা সন্ন্যাসী হওয়া নয়, বরং দুনিয়াকে আখেরাতের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা এবং হালাল উপার্জনের পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য বজায় রাখা।

পরকালের জন্য প্রস্তুতির আরেকটা মাধ্যম হচ্ছে যথাসম্ভব দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক, দুনিয়াবি ব্যস্ততা এবং পার্থিব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ফিকির কমিয়ে দেওয়া। যেন দুনিয়া ভাবনার প্রধান কারণ এবং জ্ঞানের একমাত্র দিক না হয়। কেননা সকল দিক থেকেই দুনিয়ার চেয়ে উত্তম হলো আখিরাত। আখিরাত চিরস্থায়ী, তার নেয়ামতরাজিও চিরস্থায়ী। অন্যদিকে দুনিয়া অস্থায়ী এবং তার সবকিছুই অস্থায়ী ও ক্ষণিকের। বুদ্ধিমান মুমিন কখনো খারাপকে ভালোর ওপর প্রাধান্য দিতে পারে না। চিরসুখের পরিবর্তে ক্ষণিকের আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দিতে পারে না। আখিরাতের ওপর দুনিয়ার ভালোবাসা এবং দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়াই হচ্ছে সকল অপরাধের মূল।

- একটি বাস্তব উদাহরণ:

দশটা দোকানের মালিক আর একটা দোকানের মালিকের মধ্যে পার্থক্য অনেক। কোনো সন্দেহ নেই যে, যার দোকান মাত্র একটা, সে পরকালের প্রস্তুতি বেশি নিতে পারবে: কারণ দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক কম। পক্ষান্তরে যার দশটা দোকান, সে দোকান সামলাতেই হিমশিম খাবে। কখন সে আখিরাতের প্রস্তুতি নেবে। তাই দুনিয়ার ব্যস্ততা মানে হলো আখিরাতের ক্ষতি।

অধিকাংশ মানুষই কেবল দুনিয়া সম্পর্কে বেশ অবহিত। কীভাবে দুনিয়া কামাবে, দুনিয়ায় উন্নতি করবে-এর প্রতিটা পথ ও প্রতিটা অলিগলি সম্পর্কে সে সদা সজাগ ও সদা অবগত থাকে। কিন্তু পরকাল সম্পর্কে থাকে একেবারেই গাফেল, পূর্ণ বেখবর। আখিরাতের জন্য কী উপকারী আর কী অপকারী, সে সম্বন্ধে তারা বড়ই অজ্ঞ। যেন অনুভূতিহীন মানুষ; যার কোনো কিছুর চিন্তা নেই। অথচ আল্লাহ এগুলোকে বানিয়েছেন ফেতনা ও পরীক্ষার বস্তু হিসেবে। যাতে করে তিনি জানতে পারেন, কে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রতারিত হয় এবং কে উত্তম আমল করে সফল হয়। তাই মানুষ যত বেশি দুনিয়ার ব্যস্ততা পরিহার করবে, আখিরাতের জন্য তার প্রস্তুতি তত বাড়তে থাকবে।

অপরদিকে ঈমানি পরিবেশ মুসলমানকে তার পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা করে। ঈমানী পরিবেশ হলো এমন একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরিমণ্ডল, যা মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয়, পরকালের চিন্তা এবং সৎকর্মের স্পৃহা জাগ্রত রাখে। এটি ইসলামের আলোয় জীবন যাপনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পরকালের কল্যাণ অর্জনে উত্তম ও নেককার লোকদের সঙ্গী হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে, যাদের সাক্ষাৎ আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেবে ও তাঁর ইবাদতের ব্যাপারে উৎসাহিত করবে।

খারাপ ও বদকার লোকদের সাথে থাকা গুনাহের নিকটবর্তী করবে ও আল্লাহর ইবাদত ও পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। অন্তর, মন-মস্তিষ্ক, এমনকি দেহকেও আল্লাহর নাফরমানি ও দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে দেবে।

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনেও নির্দেশ দিয়েছেন, উত্তম লোকদের সঙ্গ গ্রহণ করতে, প্রবৃত্তির বিপরীতে গিয়ে তাদের সাথে থাকতে। পার্থিব কোনো কারণে সালেহীন ও নেককারদের সুহবত ত্যাগ না করা। তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে না রাখা। যদি তারা দরিদ্রও হয়, তবুও তাদের সান্নিধ্যে থাকার কথা বলা হয়েছে। কেননা, তাদের সুহবতে অনেক উপকারিতা রয়েছে। যা গণনা করা সম্ভব নয়।

ঈমানী পরিবেশ ও নেক সঙ্গ থেকে দূরে থাকায় কেবল ক্ষতিই রয়েছে। এ কারণে আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে এবং এটা অন্তরকে দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করিয়ে দেবে। ফলে চিন্তা-চেতনা সবকিছুই হয়ে যাবে দুনিয়া কেন্দ্রিক। অন্তর হয়ে উঠে পরকালের চিন্তা থেকে মাহরুম। কেননা, দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতিই দৃষ্টি আটকে থাকবে এবং এর প্রতিই অন্তর আকৃষ্ট হবে। ফলে আল্লাহর যিকির থেকে অন্তর গাফেল হয়ে যাবে। আল্লাহর যিকিরের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুনিয়ার তুচ্ছ ও নোংরা কামনা-বাসনার প্রতি মন আকৃষ্ট হতে থাকবে।

তাই বন্ধুত্ব করার পূর্বে প্রত্যেককে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাচ্ছে। সে যাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে চাচ্ছে, সে কি তার ধর্ম-বিশ্বাস ও তার আমল-আখলাকের ওপর সন্তুষ্ট? সে কি তা পছন্দ করে? যদি করে তবেই তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে। অন্যথায় তাকে পরিত্যাগ করবে।

বন্ধুই পারে একজন মানুষের বাস্তব অবস্থা, তার চরিত্র-চালচলন, এমনকি তার পুরো জীবনটাই পরিবর্তন করে দিতে। নেক বন্ধু যেমন একজন মানুষের জীবনকে পবিত্রতার ঘ্রাণে সুবাসিত করতে পারে, তেমনি একজন খারাপ বন্ধু জীবনকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। প্রবাদে আছে:

"বন্ধু-ই বন্ধুকে টেনে নিয়ে যায়। ভালো হলে ভালো পথে, আর খারাপ হলে খারাপ পথে।”

ঈমানী পরিবেশে থাকা, সৎ ও ঈমানদার মানুষের সাহচর্য মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও কু-প্রভাব থেকে রক্ষা করে। এটি মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও পরকালের চেতনা জাগ্রত রাখে। কেননা চারপাশের মানুষ যখন ইবাদত ও ভালো কাজে মশগুল থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই নেক কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। একটি ভালো পরিবেশ মানুষকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করে। পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সততা চর্চার ফলে সমাজ সুন্দর হয়। খারাপ পরিবেশ ও পাপাচার থেকে দূরে থাকলে অন্যায় কাজ বা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। ফলে ব্যক্তি পরকালের প্রতি ঝুঁকে সেই অনন্তকালীন জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণের দিকে অগ্রসর হয়।

পরকালের উদ্দেশ্যে সাদকায়ে জারিয়াহ রাখা

'সাদকায়ে জারিয়াহ' বা 'সাদাকাতুন জারিয়াহ্' আরবি শব্দ। সাদকা শব্দের অর্থ দান করা। আর জারিয়াহ শব্দের অর্থ প্রবহমান, সদাস্থায়ী ইত্যাদি। সাদকায়ে জারিয়া হলো- এমন দান যার কার্যকারিতা কখনো শেষ হবে না এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

পরকালের অনন্ত মুক্তির জন্য সাদকায়ে জারিয়াহ হলো সর্বোত্তম মাধ্যম। এটি এমন এক চলমান দান, যার সওয়াব বা প্রতিদান ব্যক্তি মৃত্যুর পরও কবরে বসে পেতে থাকে। হাদীস অনুযায়ী, সাদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে দান করা সম্পদের প্রভাব পৃথিবীতে যতদিন অবশিষ্ট থাকে, ততদিন দাতার আমলনামায় পুণ্য যুক্ত হতে থাকে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সাদকায়ে জারিয়ার আমলের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা। তবে দান কাউকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে করতে হবে।

আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেছেন,

'যখন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল স্থগিত হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ছাড়া;
১. সাদাকায়ে জারিয়া,
২. এমন জ্ঞান, যা থেকে মানুষ উপকৃত হয়,
৩. এমন সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।'
(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৩১)

মুমিন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরেও তার কাছে যেসব নেক আমল পৌঁছাতে থাকে তার মধ্যে একটি হল ইলম যা সে দুনিয়াতে প্রচার করে গিয়েছে। তদ্রুপ তার নেক সন্তানগণ, যাদেরকে সে দুনিয়াতে রেখে গিয়েছে, যারা প্রতিনিয়ত পিতা মাতার জন্য দু'আ, দান- সাদকা করছে। আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলছে। কিংবা জীবিত অবস্থায় সুস্থ থাকাকালীন সে যে ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করেছে। সেসব কাজের সওয়াব মৃত্যুর পরেও তার কবরে পৌঁছাতে থাকবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

“নিশ্চয় আল্লাহ তা’য়ালা জান্নাতে নেককার বান্দাদের মর্তবা অনেক বাড়িয়ে দিবেন। তখন তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, 'হে আল্লাহ! আমি এত উচ্চ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলাম?' আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'তোমার সন্তানেরা তোমার জন্য ইস্তেগফার করেছে, যার বদৌলতে তুমি এই মর্যাদার অধিকারী হয়েছো।”
(মিশকাত)

সাদকায়ে জারিয়াহ মূলক যেসব কাজ হতে পারে-

১. রক্ত দান করার মাধ্যমে।
২. এতিমের লালন-পালনের দায়িত্ব নেওয়া।
৩. মসজিদ নির্মাণ বা মসজিদের প্রয়োজনীয় আসবাবের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা।
৪. এলাকায় প্রয়োজনীয় পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া।
৫. কুরআন শিক্ষা দেওয়া বা কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া।
৬. অসহায়-দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থায় হাসপাতাল নির্মাণ বা চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেওয়া।
৭. কবরস্থানের জন্য জমি দান করা অথবা জমি ক্রয়ে আর্থিক সহায়তা করা। মৃতদের সৎকারের খরচ জোগানো কিংবা বহনের জন্য এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ে সাহায্য করা।
৮. মুসলমানদের কল্যাণে আসে এমন ইসলামি বই-তাফসির, হাদীস, ফিক্বহ শাস্ত্রের বই-পুস্তক মুদ্রণ কিংবা বিতরণে সহায়তা করা।
৯. অত্যাচারিত মুসলমান সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ানো।
১০. গাছ লাগানো, যেটির ফল ও অক্সিজেনের মাধ্যমে মানুষ, অন্যান্য জীব উপকৃত হবে।

ইলম অর্জন ও কুরআনের সাথে সম্পর্ক তৈরি

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই ছিল "اِقْرَأْ"- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

"যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি।"
(তারীখে তাবারী ৬/৫৭২)

পরকালের প্রস্তুতিস্বরূপ একটি উত্তম পরিকল্পনা হলো, শরয়ী ইলম অর্জন করা। প্রত্যেক মুসলমানই দ্বীনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে দৈনিক একটা সময় নির্ধারণ করবে। শরয়ী হুকুম-আহকাম, জায়েয-নাজায়েযের মাসয়ালা, তাওহীদ ও শিরকের মধ্যকার পার্থক্য, আনুগত্য ও অবাধ্যতা, সুন্নাত ও বেদআতের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে অবগত হবে। ফলে জানা যাবে আমলের ফযীলত ও উত্তম আখলাক সম্পর্কে। এভাবে এক সময় সে জান্নাতের পথ চিনতে পারবে। পূর্ণ মনোযোগের সহিত আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করতে পারবে। আখিরাতের চূড়ান্ত সফলতা লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়, এমন সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

রাসূল (সা:) বলেছেন-

"ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।"
(ইবনে মাজাহ:১/২০)

দ্বীনি ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও আরেকটি ভাগ ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে।

শরয়ী ইলম অর্জনের সুফলগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, এটি মানুষের মাঝে আল্লাহর আযাবের ভয় বৃদ্ধি করে। আখিরাতের বিষয়াদি সংরক্ষণের ব্যাপারে সতর্ক করে তোলে। কঠিন ভয়ংকর সেদিনের ব্যাপারে হাজারও হিসাব-নিকাশ করার মনোভাব তৈরি করে। ফলে তারা কোনো কথা বলা কিংবা কোনো কাজ করার আগে হাজারও হিসেব কষে নেয় যে, এতে কি তার প্রতিপালক সন্তুষ্ট হবেন না অসন্তুষ্ট হবেন?

এছাড়া পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআন আলোর ফোয়ারা, নূরের ধারা। সত্য- কঠিন পথের দিশারি। এর মাধ্যমে অর্জন হয় আত্মিক ও দৈহিক প্রশান্তি। কুরআন হলো রহমত ও হিদায়াত।

আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির একটি অন্যতম কড়ি হলো কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। তাই পরকালীন জীবনের প্রস্তুতিস্বরূপ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরআন তিলাওয়াতের জন্য দৈনিক একটি সময় নির্ধারণ করা।

পরিশেষে, কবরের সেই অন্ধকার জীবনে সেই সফলকাম হবে যে আল্লাহর ভালোবাসা নিয়েই তাঁর সামনে হাজির হবে। এই ভালোবাসা পরিমাপ করা যায় কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ অনুসারে, বান্দার সাথে কুরআনের কতটুকু সম্পর্ক সে অনুসারে। যদি মহান আল্লাহকে ভালোবাসার পরিমাণ বেশি হয়, তবে কুরআন তিলাওয়াতও বেশি হয়ে থাকে।

জবানকে সংযত রাখা

জবানকে সংযত রাখা বা বাকসংযম হলো ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এটি মানুষের আত্মশুদ্ধি, পারস্পরিক সুসম্পর্ক এবং পরকালীন মুক্তির জন্য অপরিহার্য। জিহ্বা মানবদেহের সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গ, যা সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। তাই জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জবান মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে আবার সেই জবানই মানুষের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আল্লাহভীতি ও সদাচরণ এই দু'গুণের কারণেই জান্নাতীরা সাধারণত জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। পক্ষান্তরে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের কারণেই বেশিরভাগ মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জবান ভয়ংকর এক বস্তু। যা জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে। ভালো কথার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। অন্যায় ও অশালীন কথায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। যার দরুন তাকে জাহান্নামে যেতে হয়।

মানুষের জিহ্বা ও লজ্জাস্থান সকল পাপের জননী। এ দুইয়ের ইন্ধনেই অধিকাংশ পাপ হয়ে থাকে। তাই দু'টির কেউ জিম্মাদারী নিলে রাসূলুল্লাহ (সা:) তার জান্নাতের জিম্মাদারী নিবেন। এ দু'টিকে সৎ পন্থায় ব্যবহার করলে তার জন্য জান্নাতে যাওয়া সহজ। জটিল ফিতনার সময়ও মুখ বন্ধ রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা:) সাহাবীদের নসিহত করেছেন।

সুফিয়ান ইবনু আবদুল্লাহ আস-সাকাফী (রা:) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন একটি কথা বলুন, যা আমি ধারণ করতে পারি। তিনি বললেন: তুমি বল, আল্লাহই আমার রব, প্রভু তারপর এতে সুদৃঢ় থাক। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবার বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার দৃষ্টিতে আমার জন্য সর্বাধিক আশংকাজনক বস্তু কোনটি? তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেন: এই যে, এটি।
(সুনান তিরমিজি, হা. ২৪১০; ইবনু মাজাহ, হা. ৩৯৭২)

আসলাম (রহি:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন 'উমার (রা:) আবু বকর সিদ্দীক (রা:)-এর নিকট আসলেন, তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা:) নিজের জিহবা টানছিলেন। তখন 'উমার (রা:) বললেনঃ থামুন, দেখি! আপনি কি করছেন? আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা:) বললেন: এ জিহ্বাই আমাকে ধ্বংসের স্থানসমূহে নিক্ষেপ করেছে। (মিশকাত, হা. ৪৮৬৯; সহীহ আত তারগীব, হা. ২৮৭৩; শুআবুল ঈমান, হা. ৪৬৩৬)

তাই জিহ্বা মানুষের জন্য ভয়ংকর ফিতনায় রূপ নিতে পারে। কথায় মানুষের হৃদয় গলানো যায়। কথার দ্বারা কঠিন শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করা যায়। আবার কথার মারপ্যাচে কাছের বন্ধু দূরে সরে যায়। তাই প্রতিটি কথা মেপে বলাতেই কল্যাণ রয়েছে। কথার মাধ্যমে কাউকে দোষারোপ না করে বা কষ্ট না দিয়ে সংযতভাবে কথা বলাই সকলের জন্য ভালো। কথা বলার সময় নিচের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

১. **আল্লাহকে ভয় করে কথা বলা**

উমর ইবনু যর রহিমাহুমুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ فَاتَّقَى اللَّهَ امْرُؤٌ عَلِمَ مَا يَقُولُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক বক্তার জিহ্বার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তাই প্রত্যেকেই যেন আল্লাহকে ভয় করে চলে। কারণ, সে যা বলে আল্লাহ তা'য়ালা তা সবই জানেন।"
(বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, ৯/২৮৭, হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত)

২. **ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকা**

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

"আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে যেন ভালো কথা বলে, অথবা চুপ থাকে।"
(বুখারি, ৫৬৭২, ৩১৫৩; মুসলিম, ১৮২, ৪৬১০)

৩. জিহ্বা ধরে অনুশোচনা

যাইদ ইবনু আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জিহ্বা টেনে ধরে বলেছেন,

"এটাই আমার সর্বনাশ করেছে।"
(মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ২/৯৮৮, হাদীস নং ১৭৮৮)

৪. বাচ্চাদের সাথেও মিথ্যা কথা না বলা

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

"কেউ যদি তার বাচ্চাকে এভাবে লোভদেখিয়ে ডাকে, আসো, তোমাকে একটা মজার জিনিস দেব। তারপর না দেয়, তা হলে তার নামে একটি মিথ্যাচার লেখা হয়।"
(দারিমি, সুনান, ২/২৯৯; হাকিম)

৫. <u>অহেতুক কথাবার্তা থেকে সতর্কতা</u>

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,
"অহেতুক কথা বলো না, খবরদার। যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু বলাই যথেষ্ট।"

৬. <u>যে চুপ থাকে সে বেঁচে যায়</u>

খালিদ ইবনু আবী ইমরান রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেকক্ষণ তাঁর জিহ্বা ধরে রাখলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন,

أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ هَذَا، رَحِمَ اللهُ عَبْدًا قَالَ خَيْرًا وَغَيْمَ، أَوْ سَكَتْ عَنْ سُوءٍ فَسَلِمَ

"এটা নিয়ে তোমাদের জন্য দুশ্চিন্তা হয়। আল্লাহ তা'য়ালা ওই বান্দার প্রতি রহম করেছেন যে ভালো কথা বলেছে ও লাভবান হয়েছে অথবা খারাপ কথা না বলে চুপ থেকেছে, ফলে বেঁচে গেছে।"
(হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৪/২৮৬, ২৮৭)

৭. <u>চুপ থাকলে মুক্তি মেলে</u>

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَمَت نجا

"যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়।"
(তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৫০১)

৮. মূর্খ লোকের অন্তর থাকে তার জিভের ডগায়

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
"পূর্বসূরিরা বলতেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির জিহ্বা থাকে তার অন্তরের পেছেন। যখন সে কথা বলতে চায়, ভেবেচিন্তে বলে। কথায় উপকার থাকলে তা ব্যক্ত করে, অপকার থাকলে চুপ থাকে। আর মূর্খ ব্যক্তির অন্তর থাকে তার জিভের ডগায়। মুখে যা আসে তা-ই বলে ফেলে, একটুও ভাবনা-চিন্তা করে না।"

আবুল আশহাব বলেন, পূর্বসূরিরা বলতেন, "জিহ্বাকে যে সংযত রাখতে পারে না, তার দ্বীনের বুঝ নেই।"
(ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ ১৪/৩৮, ৩৯)

৯. কথার মাধ্যমে কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেললে করণীয়

কথার মাধ্যমে কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেললে তাৎক্ষণিকভাবে নিজের ভুল স্বীকার করা, আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়া, ভবিষ্যতে সতর্ক থাকা এবং তাদের জরুরত শরীয়তের মধ্যে থেকে সাধ্যমত পূরণ করার চেষ্টা করা।পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলা। যাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তিনি কী বলছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনা, তার অনুভূতির প্রতি সম্মান জানানো।

সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ-এর কাছে একদল লোক এসে তাদের জন্য সুপারিশ করতে অনুরোধ জানাল। তাঁর সঙ্গে যে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে সে কথাও উল্লেখ করল। উমর ইবনু আবদিল আযীয কেবল বললেন, হু। তারপর তারা তাদের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করল। তখন তিনি বললেন, 'দেখা যাক।' এই কথা শুনে তারা যেন মনে কষ্ট পেয়ে চলে গেল। পরে তিনি তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন।"

কবরের আযাব থেকে রক্ষাকারী সূরা

কবরের আজাব যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা আমাদের কল্পনাকেও হার মানায়। তবে দয়ালু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের একা ছেড়ে দেননি। তিনি এমন কিছু আমল শিখিয়ে দিয়েছেন, যা অন্ধকার কবরে আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়াবে।
এর মধ্যে অন্যতম সেরা আমল হলো— প্রতিদিন সূরা মুলক ও সূরা আস সাজদাহ পাঠ করা।

একটি ঘটনা-

একদা জনৈক সাহাবী একটি কবরের উপর তাঁবু তৈরি করলেন। সেটা কবর বলে তাঁর জানা ছিল না। তাঁবুতে বসা অবস্থায় হঠাৎ কবরের ভিতর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেলেন। সেখানে এক লোক সূরা মুলক তিলাওয়াত করছে এবং তিলাওয়াত করতে করতে সম্পূর্ণ সূরা শেষ করে ফেলল। সাহাবী উক্ত ঘটনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলে তাঁর কথা শুনে নবীজি বললেন, 'এই সূরা কবর আযাব ফিরিয়ে রাখে এবং তেলাওয়াতকারীকে আযাব থেকে রক্ষা করছে।'
(মিশকাত)

সূরা মুলক রাতের বেলা পড়া উত্তম, তবে অন্য যেকোনো সময়ও পড়া যাবে। সূরাটি অর্থ বুঝে নিয়মিত পড়ায় রয়েছে অনন্য তাৎপর্য। এই সূরা নামাজের সঙ্গে পড়াও উত্তম। মুখস্ত না থাকলে দেখে দেখে অর্থ বুঝে পড়লে বিশেষ সাওয়াব পাওয়া যায়। হাদীসে এসেছে-

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা মুলক তেলাওয়াত না করে রাতে ঘুমাতে যেতেন না।" (তিরমিজি)

এছাড়া পবিত্র কুরআনে আরেকটি সূরা রয়েছে, যার নাম সূরা আস সাজদাহ। এই সূরা নিয়মিত পাঠ করলে অন্তরে আল্লাহ ও আখেরাতের স্মরণ জাগ্রত হয় এবং গুনাহের ভয় ও ঈমান দৃঢ় হয়। এটি তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও নৈকট্য লাভ করা যায়।

প্রখ্যাত একজন তাবেয়ী হযরত খালেদ ইবনে মা'দান সূরা মূলক ও সূরা আস সাজদাহ সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

“এই সূরা দু'টি তার তিলাওয়াতকারীর জন্য কবরের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে ঝগড়া করবে এবং বলবে, ‘হে আল্লাহ! আমি যদি আপনার কিতাবের অংশ হয়ে থাকি তাহলে পাঠকারীর জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর যদি আমি আপনার কিতাবের অংশ না হই তাহলে আমাকে আপনার কিতাব থেকে মিটিয়ে দিন।’

তিনি আরও বলতেন, এই সূরা দু'টি তিলাওয়াতকারীর উপর পাখির ন্যায় ডানা বিছিয়ে তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে। কবরের আযাব থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আলোচ্য দু'টি সূরার বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

আমলের ফজিলত সম্পর্কে জানা ও নেক আমলের প্রতিযোগিতা

আমলের ফজিলত বা গুরুত্ব সম্পর্কে জানা মুমিনের ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবং পরকালের মুক্তির পথ সুগম করতে অত্যন্ত কার্যকর। ফজিলত জানা থাকলে মানুষ ছোট আমলেও বিপুল সওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

আখিরাতের পরিকল্পনার অন্যতম একটি অংশ হলো, তারগীব ও তারহীব-নেয়ামতের আশা ও শাস্তির ভীতি জাগানিয়া কিতাবগুলো পড়া। বিভিন্ন আমলের ফযীলতসংক্রান্ত কিতাবগুলো বেশি বেশি অধ্যায়ন করা। কারণ এ সকল কিতাব আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী, নেক আমলের ওপর স্থির থাকার ক্ষেত্রে সহায়ক।

উদাহরণত যখন যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে পড়া হবে। যখন পড়া হবে যে আল্লাহ তাআলা যিকিরকারীর জন্য আখিরাতে এই এই নেয়ামত রেখেছেন। তখন নিজের মধ্যে অধিক যিকির করার উৎসাহ সৃষ্টি হবে এবং নিয়মিত যিকিরের আমল অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

এরকমভাবে প্রতিটি আমলের ফযীলতের ক্ষেত্রে একই কথা।
যেমন কিয়ামুল লাইল, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, চাশত ও বিতর-এর নামাজ, নফল রোজা, দান-সাদকাহ, সালামের প্রসার ঘটানো, মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা, মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানো, প্রতিবেশীর হক আদায় করা, ইয়াতীমের তত্ত্বাবধান করাসহ ইত্যাদি ইবাদত। যখন প্রতিটি আমলের ফযীলত সম্পর্কে জানা থাকবে, তখন সেই আমল করার প্রতি অন্তর উদ্বুদ্ধ হবে। নিয়মিত সেই আমল করতে মন চাইবে। মন সব সময় উৎসুক থাকবে, মনের মাঝে তড়প থাকবে- কখন আসবে সে আমলের নির্ধারিত সময়।

এছাড়া আমলের ফজিলত সম্পর্কে জানা থাকলে বান্দা হতাশা ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কেননা নেক আমলের মাধ্যমে অতীত গুনাহ মাফ হওয়ার ফজিলত জানা থাকলে বান্দা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না এবং পুনরায় গুনাহ করা থেকে বিরত থাকে।

তাই আমল ও তার ফজিলত জানা ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি মানুষের বিশ্বাস ও কাজের সমন্বয়কে বোঝায়। ইসলাম ধর্মে শুধু বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, বিশ্বাসকে কাজের মাধ্যমে

বাস্তবায়িত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল কুরআন ও হাদীসে আমলের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত মুসলিম হতে, যেকোন কাজের মাধ্যমে ইবাদত ও ভাল কাজের প্রদর্শন আবশ্যক। আমলের ফজিলত সম্পর্কে জানার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার দৈনন্দিন জীবনকে শরিয়ত অনুযায়ী সুন্দর ও গোছালো করতে পারে। ফলে এটি বান্দার কবরের জীবনের আযাব থেকে রক্ষাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

পরকালীন জীবনের প্রস্তুতিস্বরূপ আরেকটি উপকারী বিষয় হলো "নেক আমলের প্রতিযোগিতা করা"। নেক আমলের প্রতিযোগিতা হলো সৎকাজে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার ঐশ্বরিক প্রেরণা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মুমিনদেরকে কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হওয়ার এবং প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

'আমলে সালেহ' বা নেক আমল ব্যক্তিকে যথাযথভাবে ধর্মকর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করে। ব্যক্তিকে বাস্তবিক ও কল্যাণকর জীবন যাপনে উৎসাহিত করে। ব্যক্তিকে পরকালীন ভাবনায় উজ্জীবিত করে। নেক আমলের উসিলায় ব্যক্তি কেবল আল্লাহপাকের প্রিয় বান্দা হিসেবে পরিচিত হয় না বরং সমাজে ভালো মানুষ হিসেবেও বিবেচিত হয়। নেক আমলের প্রাত্যহিক অনুশীলনের কারনে আমলকারী ব্যক্তি আল্লাহর মাকবুল বান্দাদের নিকটতম হবার সৌভাগ্য লাভ করে। এমন কি উক্ত নেক আমলকারী ব্যক্তি আল্লাহর পরমপ্রিয় হয়ে যায়। সমাজের সকল শ্রেনীর মানুষ তাকে পরম শ্রদ্ধা করে।

আবার শায়খ সা'দী রহ. বলেন-

"কল্যাণকর কাজের আদেশ প্রদানের পর প্রতিযোগিতার আদেশটি নতুন একটি আদেশ। কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা থাকা কাজটি বাস্তবায়িত হওয়া, পূর্ণতার সাথে অস্তিত্বে আসা এবং সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পূর্ণ হওয়া নিশ্চিত করে। প্রতিযোগিতা থাকলে কাজ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি পার্থিব কল্যাণকর কাজের ক্ষেত্রে অগ্রসর থাকবে, সে আখিরাতের কাজেও জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তীদের মাঝে থাকবে। তাই প্রতিযোগীরা মর্যাদা-বিচারে সর্বোত্তম হয়ে থাকে। কল্যাণকর কাজ দ্বারা ফরয, নফল উভয়টাই উদ্দেশ্য। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, জিহাদসহ স্বল্প ও ব্যাপক উপকার প্রদায়ক সকল আমলই প্রতিযোগিতা করা যায় এমন কল্যাণকর কাজের অন্তর্ভুক্ত।"

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নেক আমলের প্রতিযোগিতার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেছেন-

"তোমরা কল্যাণের কাজের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতা করো।"
(সূরা বাকারা, আয়াত: ১৪৮)

এছাড়া নেক আমলের প্রতিযোগিতার পূর্ব প্রস্তুতি ও নেক আমলের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সা:) এর পবিত্র জবান নিঃসৃত হাদীস, হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"সাতটি বিষয়ের পূর্বে তোমরা দ্রুত নেক আমল করো। তোমরা কি এমন দারিদ্র্যের অপেক্ষা করছ, যা তোমাদেরকে সবকিছু ভুলিয়ে দেবে? না ওই ঐশ্বর্যের, যা তোমাদেরকে দর্পিত বানিয়ে ছাড়বে? নাকি এমন রোগের, যার আঘাতে তোমরা জরাজীর্ণ হয়ে পড়বে? না সেই বার্ধক্যের, যা তোমাদেরকে অথর্ব করে ছাড়বে? নাকি মৃত্যুর, যা আকস্মিক এসে পড়বে? নাকি দাজ্জালের উপস্থিতি, যা কিছুর জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে, সে হচ্ছে সেসবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট? না কিয়ামতের অপেক্ষা করছো, যে কিয়ামত কিনা সর্বাপেক্ষা বিভীষিকাময় ও সর্বাপেক্ষা তিক্ত?"
(জামে তিরমিযী: হাদীস নং: ২৩০৬)

দৈনন্দিন সুন্নাহ পালন ও দরূদ পাঠে আযাব থেকে মুক্তি

দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব অপরিসীম; এটি একজন মুসলিমের সাধারণ অভ্যাসকেও ইবাদতে পরিণত করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈনন্দিন যে কাজ যেভাবে করেছেন, অথবা যেভাবে করার আদেশ করেছেন। সে কাজ সেভাবে করাটাই হলো সুন্নাত। প্রত্যেক মুসলমানকেই পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের ওপর আমল করার প্রতি আগ্রহী হতে হবে। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজ সুন্নাতমাফিক করাই হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত রাখা এবং তাঁকে ভালোবাসার প্রমাণ। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রতিটি কাজ সুন্নাতমাফিক করবে, বস্তুত সে ব্যক্তিই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালোবাসার প্রকৃত দাবিদার। আল্লাহ তাআলা (তাঁর নবীকে সম্বোধন করে) বলেন -

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

অর্থ: বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস; তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১)

দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহ পালনের মাধ্যমে নাজাতের আশা করা যেতে পারে। তাই নিম্নে কিছু সুন্নতের কথা উল্লেখ করা হলো:

১. ভালো কিছু খাওয়া বা পান করার সময়, কোনো কিছু লেখা বা পড়ার সময়, কোনো কাজ শুরু করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা সুন্নাত।
২. ভবিষ্যতে কোনো কিছু করার ইচ্ছা করলে 'ইনশাআল্লাহ' বলা সুন্নাত।
৩. স্বাভাবিকের মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম দেখলে কিংবা আশ্চর্য ধরনের কোনো কথা শুনলে 'সুবহানাল্লাহ' বলা সুন্নাত।
৪. কষ্ট, দুঃখ ও যন্ত্রণায়- 'ইয়া- আল্ল-হ' পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করা।
৫. ভালো যে কোনো কিছু বেশি বা ব্যতিক্রম দেখলে 'মাশাআল্লাহ' বলা সুন্নাত।
৬. ধন্যবাদ জ্ঞাপনে- 'জাঝাকাল্ল-হু খাইরান' বলা।

৭. ঘুমানোর সময়- 'বিসমিল্লা-হি আল্ল-হুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আ'হইয়া' পড়া এবং ডান কাত হয়ে শয়ন করা।

৮. ঘুমানোর পূর্বে- সূরা মুলক ও ৩ তাসবিহ পাঠ করা।

৯. ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর- 'আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আ'হইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা- ওয়া ইলাইহিন্নুশূর' পাঠ করা।

১০. খানার পূর্বে- 'উভয় হাত উত্তম রূপে ধুয়ে নেয়া এবং কুলি করা'।

১১. আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব বা বড়ত্বের কোনো কৃতিত্ব দেখলে কিংবা শুনলে 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নাত।

১২. ভালো কিছু খাওয়া বা পান করা শেষে, কোনো শুভ সংবাদ শোনা হলে, কেউ 'কেমন আছেন' জিজ্ঞেস করলে- জবাবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সুন্নাত।

১৩. খানার মাঝে মাঝে-'লাকাল 'হামদু ওয়া লাকাশ্ শুক্রু' পাঠ করা।

১৪. খানার শেষে-আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানা- ওয়া ছাক্ব-না- ওয়া জা'আলানা মিনাল মুসলিমীন পাঠ করা।

১৫. কোথাও দা'ওয়াতে খানার শেষে- 'আল্লাহুম্মা আত'ইম মান আত্'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বানী ওয়াজা'আলানী মিনাল মুসলিমীন' পাঠ করা।

১৬. শৌচাগারে প্রবেশের সময়- 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খবায়িস' বলা এবং বাম পায়ে প্রবেশ করা।

১৭. শৌচাগার থেকে বের হতে ডান পায়ে বের হওয়া এবং 'গুফরনাকাল হামদুলিল্লাহিল্লাজি আযহাবা আন্নিল আজা ওয়া আফানী' পড়া।

১৮. ওযুর শুরুতে 'বিস্মিল্লাহ' বলা।

১৯. ওযুর শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে 'আশহাদু আল লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া'হদাহূ লা শারীকা লাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মু'হাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রসূলুহ, আল্লাহুম্মাজ'আলনী মিনাত তাওয়াবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বহ্হিরীন' পাঠ করা।

২০. মসজিদে প্রবেশের সময়-'আল্লাহুম্মাফতা'হলী আবওয়াবা র'হমাতিক, পড়া এবং ডান পায়ে প্রবেশ করা।

২১. মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' এর নফল সালাত আদায় করা'।

২২. তাকবীরে উলা তথা প্রথম তাকবীরে অংশগ্রহণ করা, (যা ইমাম আল্লাহু আকবার বলে নিয়্যত করার সাথে সাথে করতে হয়, না হয় তাকবীরে উলার ফযীলত পাওয়া যায় না)।

২৩. নামাযের শেষে একবার 'আল্লাহু আকবার' এবং তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লহ', অতঃপর আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারকতা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম, তিন তাসবিহ তথা ৩৩ বার সুবহান আল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু

আকবার পাঠশেষে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া'হদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউ'হয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর' বলা।
২৪. প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসি' পাঠ করা।
পড়া।
২৫. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়- 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদ্বলিক' পড়া এবং বাম পায়ে বের হওয়া।
২৬. রাস্তা-ঘাটে কাউকে দেখলে সালাম দেয়া, কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দেয়া (এটা ওয়াজিব, না দিলে গুনাহগার হতে হবে)।
২৭। রাস্তার ডান পাশে চলা, নিচের দিকে দৃষ্টি রেখে চলা, চলার পথে কষ্টদায়ক কিছু দেখলে তা রাস্তা থেকে অন্যত্র ফেলে দেয়া।
২৮. শপথ নেয়ার সময়- 'ওয়াল্ল-হ/ বিল্লা-হ/ তাল্লাহ' (তবে কথায় কথায় কসম বা শপথ দিতে নিষেধ আছে)।
২৯. হাঁচি দিলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সুন্নাত।
৩০. অন্য কেউ হাঁচি দিলে- 'ইয়ারহামুকাল্ল-হ' বলা (এটা বলা এবং জোরে বলা ওয়াজিব, না হয় গোনাহগার হতে হবে)।
৩১. দু'আর শেষে 'আমীন' বলা।
৩২. কোন ধর্মিয় বৈঠক শেষে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বি-হামদিহী সুবহানাকাল্লাহুম্ম আশহাদু আল লা- ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক' বলা।
৩৩. নিশ্চিতভাবে না জেনে কোনো বিষয়ে কিছু বললে, কথা শেষে 'ওয়াল্লাহু আ'লাম' বলা সুন্নাত।
৩৪. কোনো বিজয় লাভ করলে কিংবা বিজয় লাভের আশায় শ্লোগান দিলে 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নাত।
৩৫. কোন সমস্যা দেখা দিলে 'তাওয়াক্কালতু 'আলাল্ল-হ' বলা।
৩৬. অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে বা দেখলে কিংবা কোনো বাজে কথা শুনলে 'নাউজুবিল্লাহ' বলা সুন্নাত। ৩৭. আনন্দদায়ক কিছু দেখলে- 'ফা-তাবারকাল্ল-হ' বলা।
৩৮. কোনো বিপদের কথা শুনলে কিংবা কোনো খারাপ বা অশুভ সংবাদ শুনলে, কোনো কিছু হারিয়ে গেলে, কোনো কিছু চুরি হয়ে গেলে, কোনো কষ্ট পেলে 'ইন্নালিল্লাহ' বলা সুন্নাত।
৩৯. আযানের ধ্বনি শুনলে মুয়াজ্জিনের সাথে হুবহু আযানের বাক্যগুলো উচ্চারণ করা প্রত্যেক বাক্যের শেষে।
৪০. আযান শেষ হলে 'আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ ওয়াস সলাতিল ক্বা-য়িমাহ আ-তি মু'হাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদ্বীলাহ ওয়াব'আছহু মাক্বামাম

মা'হমূদানিল্লাযী ওয়া'ত্তাহ 'হাল্লাত লাহূ শাফা'আতী ইয়াউমাল ক্বিয়ামাহ ইন্নাকা লা- তুখলিফুর মী'আদ' পড়া।
৪১. আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ করা।
৪২. রোগী দেখতে যাওয়া, সাথে কিছু হাদিয়া নিয়ে যাওয়া, রোগীর জন্য দু'আ করা, রোগীর কাছে দু'আ চাওয়া।

এরকম আরো ছোট বড় সুন্নাহ সম্মত আমল দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে রয়েছে, যেসবের বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা নিজেদের জীবন আলোকিত করতে পারি। হাশরের ময়দানে রাসূল (সা:) -এর শাফায়াত বা সুপারিশ পেতে এসব সুন্নাহর উপর আমল অবশ্যই সহায়ক হবে এবং তা পরকালীন জীবনের পাথেয় হিসেবে ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

পরকালীন প্রস্তুতিস্বরূপ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো নবী (সা:) এর উপর দরূদ পাঠ করা। যা কবরের আযাব থেকেও রক্ষা করবে।

দুনিয়ার নিয়ম হলো, উপস্থিত ব্যক্তিকে মুখে সালাম করা হয় আর অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট চিঠি কিংবা লোক মারফত সালাম পৌঁছানো হয়। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অসীম মেহেরবানিতে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর নবীর কাছে উম্মতের সালাম পৌঁছানোর ব্যবস্থা রেখেছেন। হাদীস থেকেও জানা যায় যে, নবী করীম (সা:) এর নিকট উম্মতের সালাম পৌঁছানোর জন্য ফেরেশতাদেরকে নিয়োগ করে আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

দরুদ পাঠে কবরের আজাব বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে একটি ঘটনা:

একবার এক আলেম স্বপ্নে দেখলেন, একটি কবর থেকে আজাবের ধ্বনি আসছে। তিনি অবাক হয়ে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দরূদ শরীফ পড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর স্বপ্নে দেখলেন, কবরের ভেতরকার ব্যক্তি বলছেন,
"হে আলেম! আল্লাহ তোমার মাধ্যমে আমার আজাব বন্ধ করে দিয়েছেন, কারণ তুমি দরূদ শরীফ পড়েছ।"
(কিতাবুর রুহ, ইমাম ইবনে কাইয়্যিম)

প্রতিটি মুহূর্তকে পরকালের পাথেয় সংগ্রহতে ব্যয়

পরকালের পাথেয় সংগ্রহের একমাত্র জায়গা দুনিয়া। পরকালীন সুখ-শান্তি ও দুঃখ-কষ্ট নির্ভর করে দুনিয়াতে মানুষের কাজকর্ম ও জীবনাচার। মানুষের সৃষ্টি এবং তাকে দুনিয়াতে পাঠানো কোনো নিরর্থক বিষয় নয়। নির্দিষ্ট একটি গণ্ডি ও সীমারেখার মধ্যে থেকে মানুষকে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

প্রতিটি মুসলমানের উচিত তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে গনীমত মনে করা, ইবাদতে কাজে লাগানো, আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য ব্যয় করা। জীবনের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সময়ও একজন মুসলিমের জন্য অমূল্য রত্নস্বরূপ। তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসই মূল্যবান। কোনো মূল্যেই একটি মুহূর্ত ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা অনেকেই সময়কে খুব সস্তা মনে করি। একজন অপরজনকে গল্প-গুজবে আহ্বান করার মানেই হলো تعال نقتل الوقت "এসো, আমরা জীবনকে নষ্ট করি।”

সময়ই হলো জীবন। যে সময় নষ্ট করে, বস্তুত সে তার জীবনই নষ্ট করে। অচিরেই তাকে তার জীবন নষ্ট করার কারণে জিজ্ঞাসা করা হবে। অনেক মানুষই আছে, যারা নিজের জীবন সম্পর্কে বেখবর। তারা অযথা কাজে তাদের জীবন নষ্ট করে, যা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য ক্ষতি ছাড়া কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। ফলে কিছুটা সময় পর তার দুনিয়া-আখিরাতে ক্ষতিকর ফলাফলই দেখা যায়। প্রতিদিনেরই নির্দিষ্ট কাজ থাকে। প্রতিটি মুহূর্তেই কাজ আসবে। তাই কোনো মুসলমানের জীবনে অবসর সময় বলতে কিছু থাকতে নেই। অবসর আসবে- ভাবতে নেই এমনটাও। কোনো আমল বা কাজে গড়িমসি করা, সেই কাজ না হওয়ারই পথ তৈরি করে। সুতরাং সময়ের কাজ সময়ে করে ফেলা উচিত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন-

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى - يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحِيَاتِي

অর্থ: সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে? সে বলবে- হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম!
(সূরা ফাজর, আয়াত ২৩-২৪)

ইমাম তাবারী রহ. বলেন- يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي - এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, দুনিয়াতে অযথা সময় নষ্ট করা, নেক আমলে কমতি করার কারণে কিয়ামতের দিন তারা লজ্জিত হয়ে আফসোস করতে থাকবে। কারণ, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনটা আখিরাতের অনন্ত সময়ের নেয়ামত প্রাপ্তির মাধ্যম। যে আখিরাতের কোনো শেষ নেই। সেদিন সে আফসোস করে করে বলবে, হায়, দুনিয়াতে অযথা সময় নষ্ট না করে যদি নেক আমল করতাম! যদি এই চিরস্থায়ী জীবনের জন্য কিছু পাথেয় পাঠাতাম! যদি জীবনটা আনুগত্য-ইবাদতে কাটাতাম; তবে আজ আল্লাহর ক্রোধ হতে তা আমায় বাঁচাত, তাঁর অসন্তুষ্টি আমার জন্য অবধারিত হতো না। হায়, আমি এ কী করলাম! এখানে তো মৃত্যুও নেই যে, মরে বেঁচে যাব।

তাই প্রতিটি মুহূর্তকে পরকালের পাথেয় সংগ্রহের জন্য ব্যয় করা মুমিনের শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিমত্তা ও সাফল্য। মনে রাখতে হবে দুনিয়ার জীবন হলো পরকালের অনন্ত জীবনের প্রস্তুতি বা 'শস্যক্ষেত্র', যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করলে তা আখেরাতের শ্রেষ্ঠ পাথেয় হিসেবে জমা হয়।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের জন্য দু'আ

জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের জন্য দু’আ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যন্ত জরুরী ও অপরিহার্য একটি আমল। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করে এবং তার চূড়ান্ত সফলতা তথা চিরস্থায়ী জান্নাত ও ভয়াবহ শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করে।

পরকালের প্রস্তুতির আরেকটা ধাপ হলো, আল্লাহ তাআলার নিকট দু’আ করা। মুসলিম তার প্রতিপালকের সামনে ভগ্ন হৃদয়ে কাকুতিমিনতি করে দুআ করবে, তাঁর কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করবে, নেক আমলের তাওফীক চাইবে এবং নিজের জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের রাস্তাকে সহজ করে দেওয়ার জন্য দুআ করবে।

শায়খ সা'দী রহ. বলেন, আল্লাহর নৈকট্য দুই প্রকার:

১. আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত। এ দিক থেকে সকলেই আল্লাহর নিকটে।
২. বান্দার দুআ কবুল করা, তার প্রয়োজনে সহযোগিতা করা এবং তাকে নেক আমলের তাওফীক দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার নিকটে।

তাই পরকালীন জীবন সহজ ও আরামদায়ক করার জন্য আল্লাহ তা’য়ালার কাছে অধিক পরিমাণ দু'আ করতে হবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের জন্য কুরআন এবং হাদীসে অনেক দু'আ রয়েছে। সেখান থেকে কিছু দু'আ নিম্নে দেওয়া হলো:

দু'আ নং ১:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَسْتَجِيْرُ بِكَ مِنَ النَّارِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাচ্ছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দোয়াটি আমরা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা সাতবার করে পড়তে পারি।

দু'আ নং ২:

اللّٰهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই।

দু'আ নং ৩:

اللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করুন।

দু'আ নং ৪:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত এবং এমন কথা ও কাজের প্রার্থনা করছি, যা জান্নাতের দিকে এগিয়ে দেয়।

দু'আ নং ৫:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় কামনা করি, কবরের আযাব হতে আশ্রয় কামনা করি, আশ্রয় কামনা করি দাজ্জালের ফেতনা থেকে এবং আশ্রয় কামনা করি হায়াত ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে।

সুতরাং জান্নাত লাভের জন্য এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করার ফজিলত অনেক বড়। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "কোনো লোক আল্লাহ তাআলার নিকট তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করলে জান্নাত তখন বলে, হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর কোনো লোক তিনবার জাহান্নাম হতে পানাহ চাইলে জাহান্নাম তখন আল্লাহ তা'য়ালার নিকট বলে, হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন।"
(সুনানে তিরমিজি: ২৫৭২)

সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ততা

মানবজীবন একটি অমূল্য নিয়ামত। এই জীবনকে অর্থবহ এবং সুশৃঙ্খল আর কল্যাণকর করার জন্য ইসলাম আমাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা উপহার দিয়েছে।

দুনিয়া হলো অস্থায়ী আবাসস্থল। এখানে মানুষ আসে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য, চিরস্থায়ী সুখ ভোগ করার জন্য নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

“আর দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর অবশ্যই পরকালই হলো চিরস্থায়ী আবাস।”
(সুরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৪)

ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের জীবন শুধু ভোগ বিলাসের জন্য নয়; বরং আখিরাতের সফলতার জন্য প্রস্তুতির এক অনন্য সুযোগ! আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জীবনকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

দুনিয়ায় সাদামাটা জীবন যাপনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়:

সামান্যতম জীবনোপকরণই যথেষ্ট

খাইসামা ইবনু আবদির রহমান থেকে বর্ণিত, সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলেছেন,

كُلُّ الْعَيْشِ قَدْ جَرَّبْنَاهُ، لَيِّنُهُ وَشَدِيدُهُ، فَوَجَدْنَا يَكْفِي مِنْهُ أَدْنَاهُ

"কোমল ও কঠিন সব ধরনের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি। আমরা দেখেছি, সামান্যতম জীবনোপকরণই যথেষ্ট।"
(ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২০৫)

কষ্টকর জীবনযাপন

মুসআব ইবনু সা'দ থেকে বর্ণিত। হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর বাবা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন,

"আপনি কি এর চেয়ে নরম কাপড় পরতে পারেন না? অথবা এর চেয়ে উত্তম খাবার খেতে পারেন না? আল্লাহ তা'য়ালা তো আপনার জন্য জমিনকে অধীন করে দিয়েছেন, প্রাচুর্যও দিয়েছেন রিযিকে।" উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি তোমার সাথে কিছুটা বোঝাপড়া করতে চাই।" তারপর তিনি রাসূলের জীবনের কষ্টগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। এবং অবশেষে হাফসা (রা:) কেঁদে ফেললেন। উমর (রা:) বললেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-র মতো আমিও কষ্টকর জীবনযাপন করতে চাই, তা হলে হয়তো জান্নাতে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনেও তাঁদের সঙ্গে থাকতে পারব।"
(নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ১০৬৪৫)

সাদামাটা জীবন নিয়ে নবীজির বৈশিষ্ট্য

আমাদের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) সাধারণ মানুষের মাঝে থেকে খুব সাধারণ ভাবেই জীবনযাপন করেছেন। মক্কা মদিনায় শাসনকালেও তাঁর আচরণে পরিবর্তন দেখা যায় নি।

ইয়াহইয়া ইবনুল মুখতার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান বসরি (রহি.) রাসূল (সা:)-এর কথা স্মরণ করে বললেন,

"আল্লাহর কসম, তাঁর ও সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো দরজা বন্ধ হতো না; তাঁর ও মানুষের মাঝে কোনো পর্দা ছিল না। সকালে তার জন্য খাদ্যভর্তি বড়ো বড়ো পাত্র নিয়ে আসা হতো না, সন্ধ্যায়ও না। তিনি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকতেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে যে-কেউ সাক্ষাৎ করতে চাইলে সাক্ষাৎ করতে পারত। তিনি মাটির ওপর বসতেন,

মাটির ওপর তাঁর খাবারের পাত্র রাখতেন। মোটা কাপড় পরতেন। গাধায় চড়তেন। আরোহণের সময় পেছনে গোলামকে বা অন্য কাউকে বসাতেন। হাত চেটে খেতেন।"

পেটের চামড়া মসৃণ হওয়ায় নিন্দা

আবদুল্লাহ ইবনু তাউস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ানকে পেট বের করে বসে থাকতে দেখলেন। তিনি দেখলেন যে তাঁর পেটের চামড়া অত্যন্ত মসৃণ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাবুক ওঠালেন এবং বললেন, এটা কি কাফিরের চামড়া?

সুন্নাহর ব্যতিক্রম না করা

সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) জানতে পারলেন যে, ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান রঙ-বেরঙের খাবার খান। শুনে তাঁর গোলাম ইয়ারফাকে বললেন, ইয়াযীদের রাতের খাবার পরিবেশন করার খবর পেলে আমাকে জানাবে। ইয়াযীদের রাতের খাবার পরিবেশন করা হলে গোলাম উমরকে জানাল। সংবাদ শুনে উমর (রা:) ইয়াযীদের কাছে এসে সালাম দিয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ইয়াযীদের অনুমতি পেয়ে ভেতরে গেলেন। উমর (রা:) এর সামনে রাতের খাবার এগিয়ে দিলেন ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান। প্রথমে দিলেন গোশত দিয়ে তৈরি ছারিদ, উমর তাঁর সঙ্গে ছারিদ খেলেন। তারপর পরিবেশন করা হলো ভুনা গোশত। ইয়াযীদ (রা:) ভুনা গোশত খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন; কিন্তু উমর (রা:) হাত গুটিয়ে নিলেন। বললেন, ইয়াযীদ, এক বেলায় এত বাহারি রকমের খাবার? যাঁর হাতে উমরের প্রাণ তাঁর কসম, তুমি যদি তাঁদের সুন্নাহর ব্যতিক্রম করো, তা হলে এই ব্যতিক্রম আচরণ তোমাকে তাঁদের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে।"

সামান্য সম্পদ

সামান্য সম্পদে সন্তুষ্ট থাকা এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করা। সাহাবায়ে কেরামগণ সামান্য সম্পদ দিয়েই দুনিয়াবি জীবন পার করে দিয়েছিলেন।

হিশাম ইবনু উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) শামে এলেন। তিনি সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বললেন, আমার ভাই কোথায়? সবাই জিজ্ঞেস করল, তিনি কে? উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আবু উবাইদা। লোকেরা বলল, তিনি এখনই আপনার কাছে আসবেন। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু মাথায় রশি-বাঁধা একটি উটনীর ওপর চড়ে এলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করলেন। তারপর লোকদের বললেন, তোমরা চলে যাও। তারপর তিনি আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে এসে অবতরণ করলেন। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে ঢাল, তরবারি ও বাহন ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, আপনি কিছু আসবাবপত্র কিনে নিলেই তো পারেন। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, সেগুলো তো আমাকে দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।"
(আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১০১)

তালিযুক্ত জামা গ্রহণ

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সাদাসিধা জীবনের অংশ হিসেবে তালিযুক্ত জামা গ্রহণ ও পরিধান করতেন। তাঁদের এই অভ্যাসটি ছিল বিনয় এবং মহান আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই বিষয়ে ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা:)-এর জীবন। তাঁর শাসনামলে রোম ও পারস্যের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল এবং তাঁর কাছে প্রচুর রাষ্ট্রীয় সম্পদ আসত। এরপরও তিনি চরম সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন এবং তালিযুক্ত পোশাক পরতেন।

হিশাম ইবনু উরওয়ার পিতা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক আযরুআত শহরে নিযুক্ত এক কর্মকর্তা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু শামে

আমাদের কাছে এলেন। তাঁর গায়ে সুতি কাপড়ের একটি জামা ছিল। তিনি জামাটি আমার কাছে দিয়ে বললেন, এটা ধুয়ে তালি দিয়ে দাও। আমি জামাটি ধুয়ে তালি দিয়ে দিলাম। সেইসাথে কাপড় কেটে নতুন আরেকটি জামাও সেলাই করে দিলাম। জামা দুটি নিয়ে তাঁর কাছে এসে বললাম, এটা আপনার জামা আর এটা আপনার জন্য নতুন কাপড় কেটে বানিয়েছি। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নতুন জামাটি ছুঁয়ে দেখলেন। তাঁর কাছে জামাটি বেশ মসৃণ মনে হলো। বললেন, "লাগবে না নতুন জামা। পুরনোটাই বেশি ঘাম শোষণ করে।"
(ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৭৩)

সাহাবায়ে কেরামের জীবন ছিল ত্যাগ, বিনয়, ও নবীপ্রেমের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তৎকালীন সময়ে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী এবং বিপুল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও, তারা অত্যন্ত সাদামাটা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। সাহাবায়ে কেরামের এই তালিযুক্ত জামা গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণ করে, পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য তাদের অন্তরে কোনো মোহ তৈরি করতে পারেনি।

নেক আমলের সুবাসে জীবন গড়া

নেক আমলের সুবাসিত জীবন হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং দুনিয়া ও পরকালের সফলতার মূল চাবিকাঠি। সৎকর্ম বা নেক আমল মানুষের অন্তরে প্রশান্তি আনে এবং পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলে।

মুসলমানের উচিত নয় নিজেকে নির্দিষ্ট কোনো একটি ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। একটি ইবাদতই করতে থাকবে, অন্য সব ইবাদত পরিত্যাগের তালিকায় ফেলে রাখবে- এমনটা মুসলমানের জন্য শোভা পায় না। সে সব ধরনের ইবাদত করবে। জীবনের প্রতিটি বৈধ ও কল্যাণকর কাজকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদতে পরিণত করবে। ছোট থেকে বড়, ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর। উত্তম থেকে উন্নততর। যাতে করে কিয়ামতের দিন তার আমলনামায় সব ধরনের ইবাদতের অংশই জমা থাকে। তাই সকল ইবাদত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। উদাহরণত-

- দৈনিক কুরআন তিলাওয়াত করা।
- সব সময় আল্লাহর যিকির করা।
- স্বল্প পরিমাণে হলেও কিয়ামুল লাইল আদায় করার প্রতি যত্নবান হওয়া।
- বেশি বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দুরূদ পড়া।
- মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করা ও তাদের কল্যাণের জন্য দুআ করা।
- প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখা।
- সুন্নাতে মুয়াক্কাদাগুলো গুরুত্বসহকারে আদায় করা।
- সালাতুদ দুহা আদায় করা।
- আল্লাহর রাহে জিহাদ, রিবাত, ইদাদের প্রতি যত্নবান হওয়া।
- মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ডাকা।
- ইলমে দ্বীন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।
- সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ করার প্রতি আগ্রহী হওয়া।
- মানুষের নিকট দ্বীনি কিতাবাদি, অডিও-ভিডিও পৌছে দেওয়া।
- আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা ও তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা।
- দান-সাদাকা করা এবং মানুষের সাহায্য ও কল্যাণে এগিয়ে যাওয়া।
- সুন্নাত মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার প্রতি যত্নবান হওয়া।

তাই পুণ্যের কোন কাজকেই তুচ্ছ মনে করা যাবেনা। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই নিয়ত ঠিক রেখে তথা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে ছোট বড় যেকোন আমল বা কাজ করা, যা পরকালে বিরাট আমল হিসেবে বান্দার আমলনামায় যুক্ত হতে পারে এবং আল্লাহ চাইলে যা হতে পারে পরকালীন জীবনে বান্দার জন্য মুক্তির উপায়!

রবকে পাওয়ার প্রতিটি পথ অবলম্বন

আল্লাহর পথের পথিক, আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সকল পথই অবলম্বন করে। তার প্রতিটি কাজের নিয়তে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের তীব্র আকাঙ্খা, পরকালীন সেই জীবনে সফলতার তীব্র বাসনা।

তাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সকল ক্ষেত্রেই থাকে তার বিচরণ। সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সকল ইবাদত করে। আনুগত্য তাকে যেখানেই নিয়ে যাক, সেদিকে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আনুগত্য-আদেশের কারণে তাকে যেখানে যেতে হয়, সে সেখানে যায়। যেখানে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, সেখানেই আপনি তার পদচারণা লক্ষ করবেন। যদি ইবাদত ইলমের ক্ষেত্রে হতে হয়, তাকে আলেম ও তালেবে ইলমদের সাথে পাবেন। যদি আল্লাহর আনুগত্য তাকে জিহাদের আদেশ দেয়, তবে তাকে মুজাহিদদের কাতারে জিহাদের ময়দানে পাবেন। নামাজের সময় তাকে পাবেন নামাজরত বান্দাদের সাথে। যিকিরের সময় তাকে পাবেন যিকিরকারীদের সাথে। সদাচরণের সময় তাকে সদাচরণকারীদের সাথে পাবেন। আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর ধ্যান, স্বীয় সমালোচনার সময় তাকে পাবেন আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশকারীদের সাথে। আপনি যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন ইবাদতটি করতে চাও? সে বলবে, "আমি আমার রবের সকল আদেশ পালন করতে চাই। আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর আদেশগুলো পালন করতে চাই। চাই তা যেখানেই হোক, যেভাবেই হোক। এ আনুগত্য ও ইবাদত আমাকে যেখানেই নিয়ে যাক। আমি শুধু ইবাদত করতে চাই। আমার একমাত্র আগ্রহ, আমি রবের ইবাদত করব, তাঁর আদেশকে কাজে পরিণত করব এবং তা প্রতিষ্ঠিত করব। আমার প্রাণ, আমার আত্মা, আমার হৃদয়, আমার শরীর, আমার সুখ-দুঃখ- সবই তাঁর জন্য সমর্পিত। আমি তো তাঁর নিকট মূল্য অর্পণ করেছি, এবার তাঁর কাছ থেকে বিনিয়ম পাবার অপেক্ষা। আমি তো চাই তাঁর দীদার, পরকালীন জীবনে প্রিয় নবী সা: এর সঙ্গ। জান্নাতের সুবাসিত বাগানে ঘুরে বেড়ানোর সৌভাগ্য।"

সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালাকে পাওয়ার পথ একটাই। আর তা হলো, প্রতিটি কাজে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পথ অনেক এবং ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহকে পাওয়ার সকল পথই অবলম্বন করতে হবে। একটা পথ অবলম্বন করে বাকিগুলো পরিত্যাগ করা যাবেনা। তবেই মুমিন হতে পারে সফলকাম ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার

মৃত্যু, কবর ও তার পরবর্তী কালীন প্রস্তুতি নিয়ে আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া একটা চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করেন। তা হলো-

استعدي للموت يا نفس واسعي ... لنجاة فالحازم المستعد
قد نبئت أنه ليس للحي ... خلود ولا من الموت بد
أنت تسهين والحوادث لا ... تسهوا وتلهين والمنايا تجد
إنما أنت مستعان ما سوف ... تردين والعواري ترد
لا ترجي البقاء في معدن الموت ... ودار حقوقها لك ورد
أي ملك في الأرض أو أي حظ ... لامرئ حظه من الأرض لحد
كيف تهيني أمرا ولذاذة ... أيام عليه الأنفاس فيها تعد.

অর্থ: “হে নফস! তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নাও এবং মুক্তির জন্য চেষ্টা করো। তবেই তুমি দৃঢ় সংকল্পকারী ও প্রকৃত প্রস্তুতি গ্রহণকারী। তুমি অবহিত আছো যে, কোনো প্রাণীর চিরকাল থাকার অধিকার নেই এবং মৃত্যুর বিকল্প কোনো পথ নেই। তুমি কেবল সামান্য সময় ধার নিয়েছো, অচিরেই তুমি তা ফিরিয়ে দেবে। আর ধারকৃত বস্তু ফিরিয়েই দিতে হয়। তুমি অন্যমনস্ক হতে পারো, কিন্তু বিপদাপদ অন্যমনস্ক নয়। তুমি খেলতামাশায় মত্ত থাকতে পারো, কিন্তু মৃত্যু যথাযথ সময়ে-ই আসবে। মৃত্যুর সাম্রাজ্যে তুমি বেঁচে থাকার আশা করো না। এটা এমন গৃহ, যেখানে অবধারিত মৃত্যু তোমার উপর অবতীর্ণ হবেই। জমিনের মধ্যে কিসের মালিকানা, আর কিসের ভাগ-বণ্টন? জমিনে প্রত্যেক ব্যক্তির অংশ হলো, কেবল এক টুকরো কবর। মানুষ কীভাবে কয়েকটি দিনের উপর আনন্দ-ফুর্তির মোহে পড়ে, যে দিনগুলির শ্বাস-প্রশ্বাসেরও হিসাব নেওয়া হবে?”

কবরের জীবন বা 'আলমে বারযাখ' হলো দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী একটি অন্তরালবর্তী স্থান। এই জীবনেই মৃত ব্যক্তির ঈমান ও আমলের পরীক্ষা নেওয়া হয়। তাই পরকালের অনন্ত মুক্তির জন্য সৎকর্ম, নিয়মিত ইবাদত ও তওবার মাধ্যমে প্রস্তুতি নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কবরের জীবন হলো চূড়ান্ত আখিরাতের প্রবেশদ্বার। পার্থিব জীবনের চাকচিক্য ও ক্ষণস্থায়ী মোহে না পড়ে, মৃত্যুর পরবর্তী এই কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়াই একজন মুমিনের প্রধান দায়িত্ব।

কিন্তু আফসোস, গাফিলতির চাদর আমাদের এমন করে ঢেকে নিয়েছে যে, আমরা এর বাইরের কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের কর্ণসমূহ বধির হয়ে গেছে; ফলে আমরা শুনতে পাই না কোনো নসিহতকারীর নসিহত। তবে যারা বুদ্ধিমান, তারা গাফিলতির চাদর ফেলে দিয়ে শেষ পরিণতি মন্দ হওয়ার ব্যাপারে সদা সজাগ ও সতর্ক থাকে। আল্লাহর আজাবের ভয়ে তটস্থ থাকে। এর জন্য কেঁদে কেঁদে রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দেয়। অবশ্য অনেক সময় আল্লাহর রহমতের আশা তাদেরকে কান্না থেকে বিরত রাখে ঠিকই, কিন্তু যখনই শেষ পরিণতির কথা তাদের মনে পড়ে, তখনই পূর্বের চেয়ে অধিক গুণে তার জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

যে ব্যক্তি কবরের চিন্তাকে তার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে, সর্বদা মৃতদের নিয়ে ফিকির করে এবং নিজের আসন্ন পরিণতি নিয়ে ভাবে, তার আমল করার তাওফিক লাভ হয়। সে যখন কল্পনা করে, তার সুগঠিত কোমল শরীর একদিন কবরের অন্ধকার গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে, তার শরীরে পচন ধরবে, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জোড়াগুলো খুলে যাবে এবং তার সামনে তার গন্তব্য স্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন সে অন্যের মৃত্যু দেখে নিজের মৃত্যু নিয়েই বেশি চিন্তা করবে।

কোনো বস্তু হারিয়ে গেলে তবেই তার মূল্য বুঝে আসে। কোনো বস্তু হাতের নাগালে থাকলে মানুষ তার মূল্য বোঝে না। কিন্তু যখন তা হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন সে বুঝতে পারে। যেমন: সুস্থতার মূল্য তখনই বুঝা যায়, যখন মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। নিরাপত্তার মূল্য তখনই বুঝা যায়, যখন মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়। জীবনও তাই। জীবনের মূল্য তখনই বুঝতে পারা যায়, যখন মানুষ মারা যায়। কারণ, তাদের সামনে তখন সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায় এবং বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নেক আমলের মূল্য কী, তা তখনই বুঝতে পারে মানুষ। কারণ সেখানে নেক আমল ছাড়া অন্য কোনো মুদ্রা চলে না। নেক আমলের মাধ্যমেই সেখানে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলত প্রমাণিত হয়।

মৃত্যুর পর যখন তাদের অবহেলিত নেক আমলের মূল্য বুঝে আসে, তখন আফসোস করে হাত কামড়ায়। দুনিয়ায় সে আরেকবার ফিরে আসতে চায়। যারা নেক আমল করেছে, নেক আমলের এত এত মূল্য দেখে তারাও ফিরে আসতে চায় দুনিয়ায়। যেন আরও অধিক নেক আমল করতে পারে। কিন্তু নেক আমলে শিথিলতা করার ওপর তাদের অর্থাৎ মৃত লোকদের এই অনুশোচনা কোনো কাজে আসবে না। তাদের দুনিয়াতে ফিরে আসার ইচ্ছা অসম্ভব বস্তু

অর্জনের ইচ্ছার ন্যায়, যা কখনো পূরণ হওয়ার নয়। তারা এই অনুশোচনা নিয়েই সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে।

তাই দুনিয়ার থাকাকালীন প্রতিটি মুহূর্তকে সৎকাজে ব্যয় করা এবং আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে জীবন পরিচালনা করাই কবরের অনন্ত জীবনে মুক্তির একমাত্র উপায়। কবরের প্রস্তুতি হলো পরকালের অনন্ত জীবনের জন্য নেক আমল ও ঈমান মজবুত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা। এর মূল চাবিকাঠি হলো আল্লাহর হুকুম পালন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ এবং খাঁটি তওবার মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত রাখা। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহ ত্যাগ করে পরকালের প্রস্তুতি নিলে কবরের প্রথম রাত বা 'লাইলাতুল ক্বাবর' শান্তিময় হতে পারে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থপঞ্জিকা

১. কবরের প্রস্তুতি কীভাবে নিবেন? মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবরাহীম, মে- ২০১৫ইং।

২. কবর ও হাশর, হযরত মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী মুহাজেরে মদনী (রহ.), ডিসেম্বর- ২০১২ইং।

৩. শেষ মুহূর্ত, মাওলানা তারিক জামিল, মার্চ- ২০২১ইং।

৪. সালাফদের বর্ণনায় কবর, ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া (রহ.), সেপ্টেম্বর- ২০২১ইং।

৫. জীবনের ওপারে, ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক আল ইশবিলি (রহ.), জুন- ২০২০ইং।

৬. পরকালের প্রস্তুতি, শাইখ খালিদ আল হুসাইনান (রহ.), অক্টোবর- ২০১৮ইং।